দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

বন্দে মাতরম্
‘এক অবিরাম দেশশ্লোক’
— পৃঃ ১৫

ভারতবাসীর জাতীয় প্রেরণা
সার্ধশতবর্ষে
বন্দে মাতরম্— পৃঃ ১১

৭৮ বর্ষ, ১১ সংখ্যা।। ১০ নভেম্বর, ২০২৫।। ২৩ কার্তিক, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

বন্দে মাতরম্

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।।
সপ্তকোটীকণ্ঠ-কল-কল-নিনাদকরালে
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে!
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং।
নমামি কমলাম্
অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাং মাতরম্।
বন্দে মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্।।

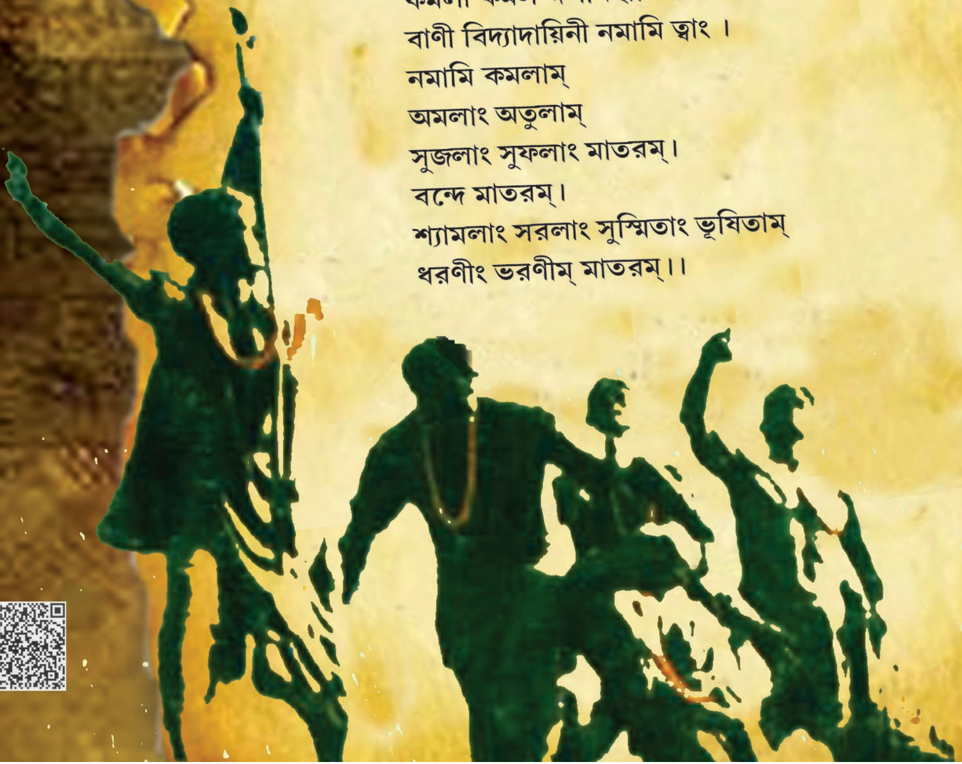

কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ১১ সংখ্যা, ২৩ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১০ নভেম্বর - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

বাম সহোদরের মতো তৃণমূলও কি ‘জল ভোটেই’ জিতছে? সানাইখানা গর্জে যত... ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

টোটো মানে ভোটও ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের নির্দেশক হিসেবে ‘প্রজনন পার্থক্য’ কি একটি সূচক? ◻ মণিপুষ্পক ◻ ৮

ভারতবাসীর জাতীয় প্রেরণা সার্ধশতবর্ষে বন্দে মাতরম্ ◻ গৌতম সরকার ◻ ১১

বন্দেমাতরম—‘এক অবিরাম দেশশ্লোক’ ◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ১৫

কংগ্রেস শুধু দেশকে দ্বিখণ্ডিত করেনি, স্বাধীনতা সংগ্রামের স্তবমন্ত্র বন্দে মাতরম্‌কেও খণ্ডিত করেছে ◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ১৭

তৃণমূলি বেশে কমিউনিস্টরা ◻ অজয় ভট্টাচার্য ◻ ২০

স্বস্তিকার শ্রীশ্রী কালীপূজার পঞ্চাশ বছর ◻ বিজয় আঢ্য ◻ ২৩

ভারতে শক্তিসাধনার ইতিহাস (তৃতীয় পর্ব) ◻ ড. অনিমেষ চক্রবর্তী ◻ ৩১

রাষ্ট্রচেতনার সূতিকাগার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ◻ দুর্গাপদ ঘোষ ◻ ৩৫

বঙ্গপ্রদেশে শ্রীগুরুজী : কিছু স্মৃতিকথা ◻ ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ৩৮

সঙ্ঘ এক গভীর অনুধ্যানের বিষয় ◻ ধর্মানন্দ দেব ◻ ৪৩

বন্দেমাতরম্ মন্ত্র দেশবাসীর হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়েছিল ◻ অমিত চৌধুরী ◻ ৪৪

ষষ্ঠ তফশিলের অধীনে লাদাখের অন্তর্ভুক্তিতে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে ◻ অরুণ কুমার চক্রবর্তী ◻ ৪৫

আগামী পনেরো বছরে একশো বিলিয়ন ডলারের লগ্নি দেশে দশ লক্ষ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করবে ◻ পীযূষ গোয়েল ◻ ৪৬

আজ ধ্বংসের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ ◻ অমলেশ মিশ্র ◻ ৪৭

বঙ্গভঙ্গ ও পরবর্তী সময়ে বঙ্গের স্বদেশী আন্দোলনের বন্দে মাতরমের ভূমিকা অবিস্মরণীয় ◻ কৌটিল্য ◻ ৪৯

গল্পকথায় ডাক্তারজী : সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৬-৩০ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে ১৭ নভেম্বর ২০২৫

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৭ নভেম্বর ২০২৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

গুরু তেগবাহাদুরের আত্মত্যাগের ৩৫০ বছর

দেশ, জাতি ও ধর্মরক্ষার জন্য জীবন বলিদানের উদাহরণ ভারতবর্ষে কম নয়। শিখপন্থের নবম গুরু তেগবাহাদুরের আত্মত্যাগের ঘটনা ভারতবাসীর হৃদয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় গুরু তেগবাহাদুরের আত্মত্যাগের ৩৫০ বছর উপলক্ষে শিখ গুরুপরম্পরা এবং গুরু তেগবাহাদুরের জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করবেন রবিরঞ্জন সেন, শিবাজী প্রসাদ মণ্ডল, ড. রাকেশ দাশ প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

‘বন্দে মাতরম্’-এর অঙ্গচ্ছেদ স্বীকার্য নহে

‘বন্দে মাতরম্’ শব্দবন্ধের অর্থ হইল মাতাকে বন্দনা করি। এখানে মাতা বলিতে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃভূমিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। মাতৃভূমির বন্দনা তথা মাহাত্ম্য কীর্তন ভারতীয় সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। অথর্ববেদে উল্লেখিত হইয়াছে— ‘মাতাভূমি পুত্রোহহম্ পৃথিব্যাঃ’। অর্থাৎ এই পৃথিবী হইল আমার মাতা এবং আমি তাহার পুত্র। শুক্লযজুর্বেদের রাষ্ট্রবিবর্ধন মন্ত্রে দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য ধরিত্রীমাতার নিকট প্রার্থনা করিবার কথা বলা হইয়াছে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র হইতে আধুনিককালের মহারাণা প্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ-সহ দেশের বীর যোদ্ধাগণ মাতৃভূমিকে স্বীয় গর্ভধারিণীর ন্যায় পূজা ও বন্দনা করিয়াছেন। বেদ-উপনিষদ-পুরাণ-ইতিহাসে যেভাবে মাতৃভূমির বন্দনার কথা বলা হইয়াছে, তাহারই নির্যাস রূপে মাতৃভূমির স্তবমন্ত্র জাতিকে প্রদান করিয়াছেন সাহিত্যসম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন, এই গান একদিন রাষ্ট্র জাগরণের বোধন মন্ত্রে পরিণত হইবে। ১৯০৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কমিটি বারাণসী অধিবেশনে ‘বন্দে মাতরম্’কে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দিয়াছিল। তাহার পর হইতে উক্ত দিনটিকে সমগ্র ভারতে ‘বন্দে মাতরম্’ দিবস রূপে পালন করা হইয়াছে। স্বাধীনতার পূর্বে কংগ্রেসের অধিবেশনগুলি ‘বন্দে মাতরম্’ সংগীতের মাধ্যমেই শুরু করা হইত। কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য, তোষণনীতির কারণে কংগ্রেস তাহাদের সিদ্ধান্ত হইতে সরিয়া আসিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, মোল্লাবাদী মানসিকতার নিকট নতিস্বীকার করিয়া কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ‘বন্দে মাতরম্’-এর অঙ্গচ্ছেদ পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছে। দেশমাতৃকা এবং দেশমাতৃকার স্তবমন্ত্র যে অভিন্ন, তোষণনীতির কারণে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের তাহা বিস্মরণ ঘটিয়াছিল। দেশমাতৃকার স্তবমন্ত্রের অঙ্গচ্ছেদের পরিণতিস্বরূপ যে দেশমাতৃকার অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়াছে, এই প্রমাণিত সত্যকে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অস্বীকার করিবেন কীরূপে? দেশমাতৃকার বন্দনা গানের বিষয়ে মজহবি মানসিকতাকে প্রশ্রয় দিয়া কংগ্রেস দেশ ও জাতির ললাটে দুর্ভাগ্যের কালিমা লেপন করিয়াছে। তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই যে, ‘বন্দে মাতরম্’ ভারতের মর্ম সংগীত, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়োৎসারিত গান, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণাদায়ী ধ্বনি। ইহার মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম অথবা সম্প্রদায়ের কথা বলা হয় নাই। মোল্লাবাদী মুসলমানদের সহিত সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজও ‘বন্দে মাতরম্’-এর বিরোধিতা করিয়াছে। ইংরাজ তো ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্বনিকেও নিষিদ্ধ করিয়াছিল। এই ধ্বনিতে মুখরিত হইবার কারণে ভারতবাসীর উপর নামাইয়া আনিয়াছিল প্রবল নির্যাতন। তোষণনীতির কারণে কংগ্রেস তাহার প্রতিবাদ না করিয়া নীরবে সর্বপ্রকার অন্যায় স্বীকার করিয়াছিল।

১৯৩৭ সালে ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে কংগ্রেসের মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছিল। তখন দেশের রাষ্ট্রভক্ত মানুষ ভাবিয়াছিলেন, এইবার বোধ হয় জাতীয় স্বর ‘বন্দে মাতরম্’-এর উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়া যাইবে এবং ভারতবাসী তাহাদের প্রাণের সংগীত গাহিতে পারিবে। কিন্তু ক্ষমতালোভী কংগ্রেস রাষ্ট্রভক্ত মানুষের সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার ন্যায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারে নাই। অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতেও ‘বন্দে মাতরম্’ গাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছিল ইংরাজ শাসক। ইহার বিরুদ্ধে প্রখ্যাত গায়ক মাস্টার কৃষ্ণরাও অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি সংকল্প করিয়াছিলেন, অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে ‘বন্দে মাতরম্’ না গাওয়া হইলে তিনিও রেডিয়োতে কোনো গান গাহিবেন না। বহুদিন তিনি অল ই ন্ডিয়া রেডিয়োতে গান গাওয়া বন্ধ রাখিয়াছিলেন। দেশ স্বাধীন হইলে, নিষেধাজ্ঞা বাতিল হইলে পুনরায় তিনি গান শুরু করিয়াছিলেন। জাতির দুর্ভাগ্য, ১৯৫০ সালে কংগ্রেস পরিচালিত সরকার ওই তোষণনীতি মাথায় রাখিয়া ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রগীত হিসাবে খণ্ডিত ‘বন্দে মাতরম্’কেই মান্যতা দিয়াছে। তাহার পরও কংগ্রেস ঘোষণা করিয়াছে, ‘বন্দে মাতরম্’ গাওয়া বাধ্যতামূলক নহে। তামিলনাড়ু রাজ্য উচ্চ আদালত একসময় রাজ্যের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ‘বন্দে মাতরম্’ গাহিবার রায় দিয়াছিল। তখনও কংগ্রেসের একই কথা, আদালত কাহাকেও ‘বন্দে মাতরম্’ গাহিতে বাধ্য করিতে পারে না। এই বিতর্কের মধ্যে স্বস্তি যে, সার্ধশতবর্ষ পূর্বে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন, ‘একদিন প্রতিটি ভারতবাসী গানটি বেদমন্ত্রের ন্যায় গাহিবে, বিরোধিতা করা হইলেও এই গানের জনপ্রিয়তা কখনোও হ্রাস পাইবে না’— এই ঋষিবাক্য সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। ২০০২ সালে একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় ‘বন্দে মাতরম্’ বিশ্বের দ্বিতীয় জনপ্রিয় সংগীতের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। এই কথা সত্য যে রাষ্ট্রভক্ত মানুষ কোনোদিনই ‘বন্দে মাতরম্’-এর অঙ্গচ্ছেদ স্বীকার করেন নাই। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ-সহ বহু সংগঠন তাহাদের অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ ‘বন্দে মাতরম্’ গাহিয়া থাকেন। ‘বন্দে মাতরম্’-এর সার্ধশতবর্ষে দেশের কোটি কোটি রাষ্ট্রভক্ত মানুষের পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট স্বস্তিকা পত্রিকা দাবি জানাইতেছে যে, সংসদে আইন প্রণয়ন করিয়া হইলেও সম্পূর্ণ ‘বন্দে মাতরম্’-এর গায়ন বাধ্যতামূলক করা হউক।

সুভাষিতম্

অহান্যস্তময়ান্তানি উদয়ান্তা চ শর্বরী।
সুখস্যান্তঃ সদা দুঃখং দুঃখস্যান্ত সদা সুখম্।।

অর্থ ঃ যেমন সূর্যাস্তের ফলে দিনাবসান হয় এবং সূর্যোদয়ের ফলে নিশাবসান হয়, তেমনই সুখান্ত সবসময়ই দুঃখের এবং দুঃখান্ত সবসময়ই সুখের হয়ে থাকে।

বাম সহোদরের মতো তৃণমূলও কি 'জল ভোটেই' জিতছে?

সানাইখানা গর্জে যত...

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

দুধ-জল আলাদা করার এসআইআর বাঁশী বাজতেই তর্জন গর্জন চালু করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের কচি, বুড়ো ও মাঝারি নেতারা। ভয়ের ঘরে জন্ম তৃণমূলের। ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে প্রায় ৫০ কোটি ভোটারের নাম সংবলিত ভোটার তালিকা সংশোধিত হতে চলেছে। এই রাজ্যে প্রায় সাড়ে সাতকোটি ভোটারের নাম তালিকায় রয়েছে। তার ভিতর এক কোটির বেশি ভুয়ো বলে বিজেপি নেতৃত্বের দাবি। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রাপ্ত ৪৫ শতাংশ ভোটে জল আছে। ২০১৪ থেকে তৃণমূল জল ভোটেই জেতে। ২০১১ সালে হেরে যাওয়ার পরে একটি দলীয় চিঠিতে সিপিএম স্বীকার করেছিল যে, তারা জল ভোটে জিতত। সেদিনের তৃণমূলনেত্রীর কথায় 'সায়েন্টিফিক রিগিং'। ১৯৮২ থেকে ১৯৯৬ সিপিএম এইভাবেই জিতেছিল। সম্প্রতি দাবি উঠেছে যে, এই রাজ্যের ২৫০-র বেশি বিধানসভা আসনে প্রায় ৩০ শতাংশ ভোটার বেড়েছে। কলকাতার কিছু তা বিস্তর কমেছে। ব্যতিক্রম রাজনীতির অঙ্গ হলেও এক্ষেত্রে তার অঙ্গহানি হয়েছে। এসআইআর-এর পর বিহারে প্রায় ৮ শতাংশ ভোটার বাদ পড়েছে। এক তৃণমূল নেতার দাবি বিহারের থেকে কম ভোটার এখানে বাদ যাবে। বিহারে প্রায় ৩৬ লক্ষ মৃত ভোটার পাওয়া গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বিগত বছরগুলিতে অস্বাভাবিক হারে ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলেও এর বিপ্রতীপে রাসবিহারী-সহ কলকাতার অনেকগুলি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা বাড়ার পরিবর্তে উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রীর কেন্দ্র ভবানীপুর ছাড়াও বেহালা ও জোড়াসাঁকোতেও ভোটার কমেছে।

তৃণমূল নেতৃত্বের সততা নিয়ে অনেক আগেই প্রশ্ন উঠেছে। প্রচুর দাগি অপরাধী, সমাজ বিরোধী ও জেহাদি তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠায় তাদের অস্বস্তি বেড়েছে। তৃণমূল নেতৃত্বের কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। জেহাদিদের ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলার শক্তি তৃণমূলের নেই। এই মুহূর্তে তৃণমূল দলের রাশ পেশাদার আইপ্যাক সংস্থার হাতে। তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্র অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল পোস্টার নেতা হিসেবে প্রচার করেন। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১৫টি বড়ো অনিষ্ট হয়েছে। তাতে তৃণমূল দল এবং তার পরিচালিত সরকার যুক্ত নয়— এই দাবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো দিনকে রাত বানানো নেত্রীও করতে পারবেন না। মৃতদেহ নিয়ে বিভ্রান্তির রাজনীতি তৃণমূল আগেও করেছে ২০১৬-র নোটবাতিলের সময়। লাভ হয়নি। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে এ রাজ্যে বিজেপি ভালো ফল করে। সেই ভোটে বিধানসভার নিরিখেও বিজেপির ফল ছিল চমকপ্রদ। একদা বিখ্যাত কবিয়াল হরু ঠাকুর এবং তাঁর চেলা ভোলা ময়রার কথায় সানাইটা না গর্জে, যত তর্জে যে তার পোঁ-এর দল। চরম দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে গোটা তৃণমূল দলটার জেলে থাকার কথা। তদন্তকারী সংস্থা ও বিচারবিভাগের আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ এক্ষেত্রে আবশ্যক। তৃণমূলের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন জেলের বাইরে থাকার কারণেই প্রকাশ্যে আসছে তাদের এই তর্জন-গর্জন। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়! সূর্যের থেকেও বালুর তাপ বেশি! চার্জশিটে অভিযুক্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি কর্মীদের গাছে বাঁধার নিদান দিয়েছেন। অথচ তিনি যে দলের দু'নম্বর নেতা, সেই দলের বিরুদ্ধে সবধরনের দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।

একদা পশ্চিমবঙ্গের যুব কংগ্রেস নেত্রী এবং পরে তৃণমূলনেত্রীকে সিপিএম কখনও গ্রেপ্তার করেনি। অনেকে ঠাট্টা করেন যে, তিনিই অভিষেকবাবুর গ্রেপ্তার না হওয়ার কায়দাটা রপ্ত করিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের দৈনিক কাজে রাজনৈতিক নেতাদের অনুপ্রবেশ বা হস্তক্ষেপ নিশ্চিতভাবে কাম্য নয়, তা সে কেন্দ্র হোক বা রাজ্য সরকারি শাসক দল। স্বাধীনতার পর থেকেই স্বজনপোষণ এবং সম্প্রদায় তোষণের রাজনীতির জনক কংগ্রেস। ১৯৫১ সালে প্রথম ভোটার তালিকা প্রস্তুত হওয়ার পর থেকে দেশে আট বার এসআইআর হয়েছে। ২০০২ সালে পশ্চিমবঙ্গে শেষবার ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন সংঘটিত হয়। সেই সময় এনডিএ জোট পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের শরিক ছিলেন তৃণমূলনেত্রী। টুঁ শব্দটিও তখন করেননি। দল গড়ার পর থেকেই তৃণমূলনেত্রী রাজনৈতিকভাবে স্বার্থপর। তাই বিভিন্ন সময় অবিবেচকের ভূমিকা নিতে তার কোনো আপত্তি থাকে না। এসআইআর ও সিএএ বিরোধিতা তারই উদাহরণ। তাই প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, তৃণমূলনেত্রীর— দেশের আইন-কানুন, সংবিধান বিরোধিতা কি অযথা জনপ্রিয়তা আদায়ের চেষ্টা? যে কোনো কেন্দ্রীয় আইন বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তকে মুসলমান-বিরোধী আখ্যা দিয়ে অনেকটাই নিশ্চিন্ত বোধ করেন তৃণমূলনেত্রী। এটা বেদনার যে, এই রাজ্যের হিন্দু ভোটারদের একাংশ মনেই করেন না যে তাঁরা হিন্দু এবং 'হিন্দু' হিসেবেই তাঁরা এ রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেই সুযোগে বাম-কংগ্রেস ও তৃণমূল তথাকথিত সংখ্যালঘু মুসলমানদের দাবার বোড়ে বানিয়ে নির্বাচনী সংখ্যাগরিষ্ঠতার রাজনীতি করে ভোটে জেতার জন্য। তাই 'হিন্দুদের অগ্রাধিকার' প্রতিষ্ঠিত না হলে এই পোঁ-এর দলরা জিততেই থাকবে। হিন্দুরাই হিন্দুদের হন্তা হবেন। নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা। এসআইআর হলো আইন-মাফিক পরিচালিত একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া। অথচ তাতে খুঁত ধরার জন্য তারাই বিরোধিতায় মেতেছেন, যার নিজেদের নাম কিনতে প্রতিনিয়ত সংবিধান ধুয়ে জল খান। ইন্ডিজোটে শামিল বামপন্থীরা এককালে ভারতের স্বাধীনতাকে 'ঝুটা' বা মিথ্যা বলত। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী ইন্ডিজোটের দ্বিচারী রাজনীতিকদেরই একজন। এই রাজনীতিকরা ভারতের আইন-কানুন বা সংবিধানকে ন্যূনতম সম্মান করে না। সাংবিধানিক সংস্থার প্রতি তারা অপমানজনক কথাবার্তা বলে এবং তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে থাকার বড়াই করে। তাই সাধু সাবধান!

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

টোটো মানে ভোটও

ভোটপ্রিয়াষু দিদি,

ভূগোল বইকে হারিয়ে দিয়েছে আমাদের বাংলা দিদি। বইতে পড়ানো হয়, পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। কিন্তু এখন যা অবস্থা তাতে পশ্চিমবঙ্গের তিন ভাগ টোটো আর এক ভাগে স্থল। মজার শুনতে লাগলেও আসলে মজা নয়। শিক্ষিত বেকারদের ক্রীতদাস বানিয়ে রাখার এক রাজনৈতিক বুদ্ধি আপনার। প্রশংসা করতেই হবে। কিছু একটা করে খাক নীতিতে শাসকের ছত্রছায়ায় থাকা অটোচালকদের অটোক্রেসি চলত বাম আমলে। এতটাই দাপট ছিল সিটু নিয়ন্ত্রিত অটোর। এখন অটোর সঙ্গে এখন শহরে গ্রামে টোটোক্রেসি চলে।

তবে দিদি ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের মতো কঠিন ভোটের আগে টোটোচালকদের বৈধতা দেওয়ার নামে চির-ক্রীতদাস বানানোর যে পরিকল্পনা আপনি করেছেন তা পাকা মাথার কাজ। পরিবেশ দূষণ যে ভাবে বাড়ছে তাতে ব্যাটারিচালিত টোটো ভালো। কিন্তু সেই টোটোর ভিড়ে যখন সর্বদা যানজট তৈরি হয় তখন আদতে পরিবেশের কোনো উন্নতিই হয় না বরং, দূষণ দ্বিগুণ বাড়ে।

দিদি, যদি কোথাও কোনো কোনো অবৈধ ব্যবস্থা চালু থাকে তা নিয়ন্ত্রণ করা প্রশাসনের কর্তব্য। কিন্তু আমাদের রাজ্যে সব কিছুই বিচার করা হয় ভোটের অঙ্ক কষে। সেটা ফুটপাথ দখল করে থাকা হকার কিংবা রাস্তায় জমিদারি চালানো টোটো। শেষে একটা সহজ সমাধান বার করেন আপনি। অবৈধকে বৈধ বানিয়ে দাও। রাস্তার হকারদের প্রথমে অবৈধ বলে দাগিয়ে দাও। সত্যিটা বলার পরে তাঁদের রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি করে বৈধ বানিয়ে দাও। পুরসভার অনুমোদিত 'প্ল্যান'-এর তোয়াক্কা না করে যথেচ্ছ বহুতল নির্মাণের পর সামান্য জরিমানা দিয়ে তাকে 'বৈধ' করে নেওয়া হয়। এমনকী, দীঘা, মন্দারমণিতে সমুদ্রের তটভূমি সংক্রান্ত আইনি নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তৈরি হওয়া হোটেলও ভাঙা যায় না, কারণ এই রাজ্যে 'বুলডোজার রাজ' চলবে না। এবার অবৈধ টোটোকে বৈধ করার কাজ করছে রাজ্য।

> **আমাদের রাজ্যে সব কিছুই বিচার করা হয় ভোটের অঙ্ক কষে। সেটা ফুটপাথ দখল করে থাকা হকার কিংবা রাস্তায় জমিদারি চালানো টোটো। শেষে একটা সহজ সমাধান বার করেন আপনি। অবৈধকে বৈধ বানিয়ে দাও।**

টোটো মানে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ম মানার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। 'যেমন খুশি চলো'। ফলে, পাড়ার গলি থেকে জাতীয় সড়ক, সর্বত্রই তাদের অবাধ বিচরণ। রাস্তায় ভুল দিকে চলা; 'নো এন্ট্রি'-র পরোয়া না করা; যে ফাঁকে সুচ গলে না সেখান দিয়েই গলে যাওয়ার আত্মবিশ্বাস বজায় রাখা; এবং আশেপাশে দাঁড়িয়ে বা চলতে থাকা গাড়ির গায়ে নিজেদের স্বাক্ষর রেখে যাওয়া, এ সবই পশ্চিমবঙ্গের টোটোদের স্বভাবধর্ম। এমনকী অনেকে ব্যাটারির চার্জ কমে যাবে বলে রাতে আলোটাও জ্বালেন না। এসব দেখেও চুপ থাকাই দস্তুর, কারণ কে না জানে, তাদের মাথায় কার আশীর্বাদী হাত রয়েছে। অতএব টোটোর দৌলতে নিত্য যানজট, নিত্য বিশৃঙ্খলা চলবে। এবারে সেই বিশৃঙ্খলা বাড়ানোর জন্য বৈধতা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সঙ্গে একটি টোটো পিছু সেই পরিবারের ৫-৬টি ভোট নিশ্চিত। এইসব টোটোকে ভোটের সময়ে টাকাও দেওয়া যাবে ভাড়া বাবদ। কারণ, নির্বাচন কমিশনের এখনও পর্যন্ত যা নিয়ম তাতে গাড়ির সংখ্যার হিসাব রাখা হয় টোটো সেই তালিকাতেই নেই। ফলে শাসকের টোটো দাপট চলবে। এই বুদ্ধির প্রসংসা করতেই হবে দিদি। প্রশংসা বাদ দিয়ে আমি যা যা বললাম তা কিন্তু আমার বক্তব্য নয় দিদি। আমি আপনার অনুগত ভাই বলে কথা। ওগুলো লোকে বলছে তাই আপনাকেই চিঠিতে লিখলাম। পাঁচকান করব না মোটেও।

এখন রাজ্যে টোটোর সংখ্যা কমপক্ষে ১০ লক্ষ। জনসংখ্যা ১০ কোটি। মানে প্রতি ১০০ জনে একজন টোটোচালক আর ৯৯ জন যাত্রী। এটা বলছেন, পরিবহন দপ্তরের কর্তারা। খুব তাড়াতাড়ি দেখবেন, নথিভুক্ত টোটোর পাশাপাশি লাইনে এসে দাঁড়াবে নতুন অবৈধ টোটো। অশান্তি চরমে ওঠার পর প্রশাসন নিশ্চয়ই আরও এক বার এই অন্যায়কে বৈধ করে তোলার চেষ্টা করবে। সেই চেষ্টার উপরে জমা হবে নতুন অবৈধ কার্যক্রমের পলিমাটি। এ এক অনন্ত চক্র। এর থেকে মুক্তি মিলবে এমন আশা রাজ্যবাসী আর করেন না। ফলে দিদি, আপনি চালিয়ে খেলুন। দশ লক্ষ টোটো সেনা নিয়ে ভোটের ময়দানে লাফিয়ে পড়ুন। □

জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের নির্দেশক হিসেবে ‘প্রজনন পার্থক্য’ কি একটি সূচক?

অতিথি কলম

মণিপুষ্পক

ভারতের জনসংখ্যাগত পরিপ্রেক্ষিতটি বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সহাবস্থানে চিহ্নিত, যার মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান এই দুটি হলো প্রধান গোষ্ঠী। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার সময় হিন্দুরা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৪.১ শতাংশ ছিল, আর মুসলমানরা ছিল প্রায় ৯.৮ শতাংশ। পরবর্তী কয়েক দশকে ধীরে ধীরে এই অনুপাতের পরিবর্তন ঘটেছে।

১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী হিন্দুরা মোট জনসংখ্যার ৮২.৭ শতাংশ, আর মুসলমানরা ১১.২ শতাংশ উন্নীত হয়েছিল। ২০১১ সালের সর্বশেষ জনগণনায় হিন্দু জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৯.৮ শতাংশ এবং মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৪.২ শতাংশ।

যদিও হিন্দুরা এখনোও দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী, তবে মুসলমানদের তুলনামূলকভাবে উচ্চতর সংখ্যা বৃদ্ধির হার দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি ক্রম-বর্ধমান জনসংখ্যাগত অসাম্য সৃষ্টি করেছে। এই জনসংখ্যার আকারের পার্থক্য এবং তার প্রবণতা বোঝা ভারতের চলমান জনসংখ্যাগত রূপান্তর এবং তার সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

প্রজনন প্রবণতা :

ভারত বর্তমানে একটি প্রজনন রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে ভারতের মোট প্রজনন হার প্রতিস্থাপন স্তরের নীচে নেমে এসেছে।

প্রতিস্থাপন স্তরের প্রজনন হার হলো সেই হার, যেখানে একটি প্রজন্ম নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিস্থাপন করে, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় না। এটি সাধারণত ২.১ সন্তান প্রতি নারী হিসেবে ধরা হয় (Craig, 1994)। *(সারণী-১ দ্রষ্টব্য)*

সারণী ১ স্পষ্টভাবে দেখায় যে, সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীতেই প্রজনন হার ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। NFHS-5 (2019-21) অনুযায়ী হিন্দুদের প্রজনন হার ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে।

NFHS-5 (2019-21) অনুযায়ী হিন্দুদের প্রজনন হার ১.৯৪-এ নেমে এসেছে। মুসলমানদের মোট প্রজনন হারও নিম্নমুখী হলেও তা এখনোও অন্যান্য ধর্মের তুলনায় বেশি।

এই গবেষণায় এই প্রজনন পার্থক্যের কারণগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এর সম্ভাব্য জনসংখ্যাগত পরিণতি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

কারণসমূহ :

বয়সভিত্তিক প্রজনন হার

Pasupuleti প্রমুখ (২০১৭)-এর গবেষণায় দেখা যায় যে, মুসলমান নারীদের প্রজনন বয়সে হিন্দু নারীদের তুলনায় ধারাবাহিক ভাবে বেশি বয়সভিত্তিক প্রজনন হার হয়ে থাকে।

হিন্দু নারীদের ক্ষেত্রে মধ্য ও শীর্ষ প্রজনন বয়সে হারের পতন অনেক বেশি, যেখানে মুসলমান নারীদের পতন তুলনামূলকভাবে ধীর। গবেষণায় আরও দেখা যায় যে, মুসলমান নারীদের প্রজনন সময়কাল হিন্দু নারীদের তুলনায় দীর্ঘতর।

(সারণী-২ দ্রষ্টব্য)

সারণী ২ অনুসারে দেখা যায়, মুসলমান ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ে অধিক সন্তান নেওয়ার ইচ্ছা বেশি। হিন্দুদের ক্ষেত্রে দুই সন্তানের পর এই ইচ্ছা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়, যেখানে মুসলমানদের মধ্যে তা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে।

সারণি ১ : ধর্মভিত্তিক ভারতের প্রজনন হার (NFHS 1-5 অনুসারে)

	মোট প্রজনন হার				
ধর্ম	NFHS-1 (1992-93)	NFHS-2 (1998-99)	NFHS-3 (2005-06)	NFHS-4 (2015-16)	NFHS-5 (2019-21)
হিন্দু	৩.৩	২.৭৮	২.৫৯	২.১৩	১.৯৪
মুসলমান	৪.৪	৩.৫৯	৩.৪	২.৬২	২.৩৬
খ্রিস্টান	২.৯	২.৪৪	২.৩৪	১.৯৯	১.৮৮
শিখ	২.৯	২.২৬	১.৯৫	১.৫৮	১.৬১
বৌদ্ধ	৩.১	২.১৩	২.২৫	১.৭৪	১.৩৯
জৈন	২.৬	১.৯	১.৫৪	১.২	১.৬
অন্যান্য	৩.৩	২.৩৩	৩.৯৮	২.৫৭	২.১৫

সারণী ২ : NFHS-5 অনুযায়ী ধর্মভিত্তিক অধিক সন্তান নেওয়ার ইচ্ছা।						
	অধিক সন্তান নেওয়ার ইচ্ছা					
ধর্ম	জীবিত সন্তানের সংখ্যা	১	২	৩	৪ বা তার বেশি	মোট
হিন্দু	৫৯.৯	৬৩.৯	১২.৭	৭.৭	৫.৯	২৮.৭
মুসলমান	৬১.৭	৭৯.৬	২৫.৫	১৭.৮	১৩.৭	৩৬.৪
খ্রিস্টান	৭৬.২	৭৬.২	২১.৭	১৭.৭	২৫.৪	৩৪.৫
শিখ	৬৫.২	৪৮.৮	৯	৪.৮	৩.৩	২৪.৪
বৌদ্ধ	৭৪	৭০.৬	১১.৩	১৬.৫	৪.৫	২৯.৭
জৈন	—	—	—	—	—	২৯.৬
অন্যান্য	৭৫.২	৪৫.৪	২০.৭	২০.৫	২৮.৪	৩৫.১

সারণী ৩ : ধর্ম অনুযায়ী নবম শ্রেণী বা তার বেশি স্তরের শিক্ষা সম্পন্ন নারীর শতাংশ (NFHS-5 অনুযায়ী)

শিক্ষা

ধর্ম	নবম শ্রেণী বা তার বেশি স্তরের শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন (%)
হিন্দু	৫০.৬
মুসলমান	৪১.৬
খ্রিস্টান	৬২.১
শিখ	৫৯.৫
বৌদ্ধ	৬১.৬
জৈন	৮৯.৫
অন্যান্য	৪০.৩

সারণী ৩ থেকে দেখা যায় যে, মুসলমান নারীদের সাক্ষরতার হার হিন্দু নারীদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম এবং এই পার্থক্যটি পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ($p < 0.001$)।

বিভিন্ন গবেষণায় নারীর সাক্ষরতা ও প্রজনন হারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক পাওয়া গেছে (Robey, 1990; Saurabh et al., 2013; Kumar & Singh, 2025), যা এই দুই সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে।

সারণী ৪ : ধর্ম অনুযায়ী কিশোরী মাতৃত্ব (NFHS-5 অনুযায়ী)

কিশোরী মাতৃত্ব

ধর্ম	কিশোরী মাতৃত্বের হাল (%)
হিন্দু	৬.৫
মুসলমান	৮.৪
খ্রিস্টান	৬.৮
শিখ	২.৮
বৌদ্ধ	৩.৭
জৈন	১.১

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতে কিশোরী মাতৃত্বের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেলেও, NFHS-5 অনুযায়ী মুসলমান নারীদের মধ্যে ১৫-১৯ বছর বয়সের মধ্যে সন্তান ধারণের হার অন্য ধর্মের তুলনায় প্রায় ৮ শতাংশ বেশি।

গবেষণায় দেখা যায়, কৈশোরে সন্তান ধারণকারী নারীদের পরিবার সাধারণত বড়ো হয় এবং সন্তানদের জন্মের ব্যবধানও কম থাকে (Hobcraft & Kiernan, zool; Sing, 1998) এছাড়া দেখা গিয়েছে যে, মুসলমান মহিলাদের মধ্যে প্রারম্ভিক বিবাহ বা কম বয়সে বিবাহের সংখ্যা বেশি যা কিশোরীদের গর্ভধারণের সম্ভাবনা বাড়ায়, ইসলামি সম্প্রদায়ে প্রারম্ভিক বিবাহের মজহবি অনুমোদনের কারণে এটি হয়ে থাকে (Jejeebhoy, 1998; Sing & Samara, 1996; UNFPA, 2020)।

সারণী ৫ : নারী শ্রমশক্তি অংশগ্রহণ (উৎস : Open Government Data, PLFS)

নারী শ্রমশক্তি অংশগ্রহণ

	PLFS		
ধর্মীয় গোষ্ঠী	2021-22	2022-23	2023-24
হিন্দু	২৬.১	৩০.৫	৩৩.৩
মুসলমান	১৫	১৪.২	২১.৪
খ্রিস্টান	৩৪.২	৩৫.১	৩৮.৩
শিখ	১৯.৮	২৩.৫	২৬.৭
সর্বমোট	২৪.৮	২৭.৮	৩১.৭

PLFS অর্থ : Periodic Labour Force Survey

সারণী ৫ অনুযায়ী দেখা যায়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নারীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে হিন্দু ও খ্রিস্টান নারীদের কর্মক্ষেত্র অংশগ্রহণ মুসলমান নারীদের তুলনায় অনেকে বেশি এবং এই পার্থক্য পরিসংখ্যানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, নারীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধি প্রজনন হার কমায় (Ahn & Mira, 2002; Becker, 1960; Goldin,

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

** *বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

1995)। এর কারণ হলো দেরিতে বিবাহ, কর্মজীবনের চাপ এবং ছোটো পরিবারের প্রতি ঝোঁক।

সারণী ৬ : ধর্ম অনুযায়ী গর্ভনিরোধক ব্যবহার (NFHS-5 অনুযায়ী)

গর্ভনিরোধক ব্যবহার

ধর্ম	**গর্ভনিরোধক ব্যবহার** (%)
হিন্দু	৬৭.৯
মুসলমান	৬০.২
খ্রিস্টান	৬১.৮
শিখ	৬৭.৯
বৌদ্ধ	৬৭২
জৈন	৭৩.৮
অন্যান্য	৫৯.৮

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রজনন হ্রাসের প্রধান কারণ হলো গর্ভনিরোধক ব্যবহারের বৃদ্ধি।

১৯৮০-র দশক থেকে গর্ভনিরোধকের ব্যবহারের হার জাতীয় গড়ের নীচে, যদিও তা ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে।

শিক্ষা, নগরায়ন ও গণমাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে আধুনিক গর্ভনিরোধক পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে (New et al, 2017)।

বহুবিবাহ

MFHS-5 (2019-21) অনুযায়ী, বহুবিবাহের হার মুসলমানদের মধ্যে সর্বোচ্চ (১.৯ শতাংশ), এরপর অন্যান্য ধর্ম (১.৬ শতাংশ) এবং সর্বনিম্ন হিন্দুদের মধ্যে (১.৩ শতাংশ)

যদিও প্রজনন হারের সঙ্গে বহুবিবাহের সম্পর্কের বিষয়ে গবেষণা হয়নি, এই তথ্য সম্পূর্ণতার জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অবৈধ অভিবাসন ও প্রজনন হার

অনেক বাংলাদেশি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে অবৈধভাবে প্রবেশ করেন। সীমান্তের ভৌগোলিক জটিলতা, দুর্বল নজরদারি এবং স্থানীয় নেটওয়ার্কের কারণে এই অভিবাসন সহজতর হয়েছে (Datta, 2004; Mayitvaganan, 2019)।

অসমের অভিবাসী গ্রামগুলিতে নারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ আদর্শ প্রজনন হার পাওয়া যায়— ৩১.৫ শতাংশ নারীর চার বা ততোধিক সন্তান এবং ৬০.৯ শতাংশ নারী বৃহৎ পরিবারকে আদর্শ মনে করেন (Saikia et al., 2019)।

এই প্রজনন পার্থক্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ বিবেচনার পরেও অব্যাহত থাকে।

পরিণাম

হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রজনন হার দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবার উন্নতির ফলে জীবন প্রত্যাশা বেড়েছে, ফলে মৃত্যুহার কমে গেলেও জন্মহার হ্রাস পাওয়ায় বয়স্ক জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এতে নির্ভরতার হার বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর তুলনায় বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়ছে (McDonald & Kippen, 2001)।

হিন্দুরা ভবিষ্যতেও বৃহত্তম ধর্মীয় গোষ্ঠী থাকবেন, তবে তরুণ জনসংখ্যার অনুপাত কমে যাবে। অর্থাৎ হিন্দু জনসংখ্যা দ্রুত বার্ধক্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রজনন হার এখনোও প্রতিস্থাপন স্তরের উপরে রয়েছে এবং বয়সভিত্তিক প্রজনন হারও বেশি।

শিক্ষার নিম্ন স্তর, কম কর্মসংস্থান ও প্রারম্ভিক বিবাহ— এগুলিও এর কারণ।

Hadwiger Function Model ব্যবহার করে ২০৩০ ও ২০৩৫ সালের জন্য প্রজনন হারের পূর্বাভাস করা হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে মুসলমানদের প্রজনন হারও ধীরে ধীরে প্রতিস্থাপন স্তরের নীচে নেমে আসবে। তবে প্রতিবেশী দেশ থেকে অবৈধ অভিবাসনের কারণে এই পতনের গতি ধীর হতে পারে।

উপসংহার

ভারত বর্তমানে একটি ধীর গতির ধর্মীয় জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে— যেখানে হিন্দু জনসংখ্যা ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে, আর মুসলমান জনসংখ্যা বাড়ছে।

এই প্রবণতার পেছনে কিছু সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণ রয়েছে :

- নারীর নিম্ন সাক্ষরতা হার,
- প্রারম্ভিক বিবাহ,
- বৃহৎ পরিবারের প্রতি পছন্দ,
- কম গর্ভনিরোধক ব্যবহার, ও নারীর কম কর্মসংস্থান।

অতিরিক্তভাবে, অবৈধ ও বৈধ অভিবাসন এবং অভিবাসীদের উচ্চতর প্রজনন হার এই বৃদ্ধিকে আরও ত্বরান্বিত করছে।

অন্যদিকে, হিন্দু সমাজের নারীর শিক্ষা, দেরিতে বিবাহ, শহুরে জীবনযাত্রার চাপ ও ক্ষুদ্র পরিবারপ্রীতির কারণে প্রজনন হার দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।

এর ফলে, বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর অনুপাত বৃদ্ধি পাবে এবং তরুণ জনগোষ্ঠী হ্রাস পাবে— যা ভবিষ্যতে ভারতের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।

নীতিগত সুপারিশ :

- কর্মজীবন ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে ভারসাম্য আনা,
- পিতামাতাদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ও সুবিধা বৃদ্ধি,
- সন্তান প্রতিপালন সাশ্রয়ী করা,
- সচেতনতা কর্মসূচি চালু করা জরুরি।

(লেখক একজন অর্থনীতিবিদ)

With Best Compliments from-

A Well Wisher

ভারতবাসীর জাতীয় প্রেরণা সার্ধশতবর্ষে বন্দে মাতরম্

গৌতম সরকার

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বন্দে মাতরম্ এমনই একটি সংগীত তথা একটি ধ্বনি যার ইতিহাস শুধু এদেশেই নয়, সমগ্র বিশ্বের কাছে এক অনন্য, স্বতন্ত্র তথা নজিরবিহীন। একটি গান যা নিজের কাব্যময়তা, গীতি-মাধুর্য, ধ্বনিঝংকার, ওজস্বী উচ্চারণে হয়ে উঠেছে নিখাদ দেশ-বন্দনার মহামন্ত্র। পরাধীন ভারতবর্ষে যে ধ্বনি একসময় হয়ে উঠেছিল বিপ্লবী তরুণদের কণ্ঠে এক জাগরণী মন্ত্র। এই গান এবং এতে ব্যবহৃত নামাঙ্কিত শব্দবন্ধকে কেন্দ্র করে আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী যে জাগরণ দেখা গিয়েছিল তা এই দেশে আর অন্য কোনো দেশাত্মবোধক সংগীতকে ঘিরে দেখা যায় না। বিশ শতকের প্রথমার্ধে এই ধ্বনি কেবলমাত্র এই দেশের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ২২ আগস্ট ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির স্টুটগার্ট শহরে ইন্টারন্যাশনাল সোশালিস্ট কনফারেন্সে মাদাম ভিকাজী রুস্তম কামা, যাঁকে 'ভারতের বিপ্লববাদের জননী' বলা হতো, তিনি প্রকাশ করেন নিজের নক্শা করা ভারতের একটি জাতীয় পতাকা। ত্রিবর্ণ রঞ্জিত সেই পতাকার মধ্যভাগে লেখা ছিল 'বন্দে মাতরম্' শব্দবন্ধটি। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে মাদাম কামা জেনেভা থেকে প্রকাশ করেন 'বন্দে মাতরম্' নামাঙ্কিত একটি সাময়িক পত্র।

ঋষি অরবিন্দের কথায় 'বন্দেমাতরম্' হলো : 'Vision of our Mother'। গান্ধীজী বলেছেন, 'When we sing that ode to motherland, 'Bande Mataram', we sing it to be the whole of India।' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন : 'আমাদের বন্দে মাতরম্ মন্ত্র বাংলাদেশের বন্দনামন্ত্র নয়— এ হচ্ছে বিশ্বমাতার বন্দনা— সেই বন্দনার গান আজ যদি আমরা প্রথম উচ্চারণ করি তবে আগামী ভাবীযুগে একে একে সমস্ত দেশে এই মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠবে।'

'বন্দে মাতরম্' আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বদেশমন্ত্র তথা জাতীয় জাগরণের বীজমন্ত্র। এই ধ্বনিকে কণ্ঠে নিয়ে দেশের বীর বিপ্লবীরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। এঁদের মধ্যে আবার কেউ কেউ এই ধ্বনি উচ্চারণে হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুবরণ করেছেন। সেই সময় বহু স্বদেশি গানেও 'বন্দে মাতরম্' শব্দবন্ধটি বারে বারে এসেছে। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিকে কেন্দ্র করে বহু নিষেধাজ্ঞা জারি করে ব্রিটিশ সরকার। তদানীন্তন সময়ে বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ, মাদাম কামা এবং লালা লাজপত রাইয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে 'বন্দে মাতরম্' নামে তিনটি পৃথক সাময়িকপত্র। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের যুগে স্বদেশি গান গেয়ে অর্থ সংগ্রহ করা, এমনকী প্রয়োজনে ভিক্ষাবৃত্তিকেও অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর উপদেশ মেনে কলকাতায় সেই সময় 'বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়' নামে গান গেয়ে ভিক্ষাসংগ্রহকারী একটি দলের প্রতিষ্ঠা হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই সম্প্রদায়ের সভাপতি। সহ-সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং দীঘাপাচিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়। ভিক্ষা সংগ্রহকারীদের মূল উদ্দেশ্য ছিল আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ভারতে অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে শক্তিশালী করা।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে প্রথম প্রকাশিত হয় 'বন্দে মাতরম্' সংগীত। 'আনন্দমঠ'-এর সন্তান সম্প্রদায় স্বদেশ প্রেরণার উদ্দীপন সংগীত হিসেবে গানটি কখনো এককভাবে আবার কখনো সমবেত ভাবে গেয়েছেন। উপন্যাসে 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রথম গায়ক হলেন ভবানন্দ। 'বন্দে মাতরম্' শব্দবন্ধটির

> **বন্দে মাতরম্ হলো আমাদের জাতীয় প্রেরণা। যে গান কণ্ঠে নিয়ে অসংখ্য বীর বিপ্লবীর আত্মত্যাগ ও আত্মবলিদানের বিনিময়ে এসেছে আমাদের এই স্বাধীনতা। স্বাধীনতার ৭৯তম বর্ষে প্রতিটি ভারতীয় নাগরিককে যে অঙ্গীকারের শপথ নিতে হবে, তা হলো— রাষ্ট্রের স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সংগীতের মর্যাদাকেও যথোচিতভাবে রক্ষা করে চলার।**

ফঃ ২

আক্ষরিক অর্থ ‘বন্দনা করি মায়ের’। ‘মা’ এখানে দেশমাতৃকা। তিনি বঙ্গজননী তথা সমগ্র ভারতজননী। বঙ্কিমচন্দ্রের মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকার চৈত্র ১২৮৭ বঙ্গাব্দ থেকে জ্যৈষ্ঠ : ১২৮৯ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় ‘আনন্দমঠ’। এর মধ্যে চৈত্র ১২৮৭ বঙ্গাব্দে ‘আনন্দমঠ’-এর প্রথম খণ্ড দশম পরিচ্ছেদে প্রকাশিত হয় ‘বন্দে মাতরম্’ গানটি। Bengal Library Catalogue অনুসারে বঙ্গদর্শন-এর চৈত্র ১২৮৭ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০ জুলাই ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে। ‘আনন্দমঠ’ পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে।

তবে ‘বন্দে মাতরম্’ গানটি বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেছিলেন ‘আনন্দমঠ’ রচনার প্রায় আটবছর আগে অক্টোবর ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে। আরও সঠিকভাবে নিরূপণে ওই বছর ১৮ অক্টোবরের পর কোনো একটি দিন। ওই বছর ১৮ অক্টোবর দুর্গাপূজার সপ্তমী ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক ভিটে নৈহাটির কাঁটালপাড়ার বাড়িতে একসময় দুর্গাপূজার প্রচলন করেন তাঁর বাবা রায়বাহাদুর যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র কর্মসূত্রে মালদহের ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন পূজার ছুটিতে বাড়িতে এসেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ছোটোভাই পূর্ণচন্দ্রের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় রেনেটি ঘরানার কীর্তন গায়ক বলহরি দাসের কণ্ঠে ‘এসো এসো বঁধু এসো, আধ আঁচরে বসো’ গানটি শুনে মুগ্ধ হয়ে যান এবং কিছুদিন পর বঙ্গদর্শন পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায়, ১২৮১ বঙ্গাব্দে এই গানকে কেন্দ্র করে লেখেন ‘কমলাকান্ত’ গ্রন্থের অন্তর্গত ‘একটি গীত’ শীর্ষক একটি রচনা। ১২৮১ বঙ্গাব্দ অর্থে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে বলহরি দাসের কণ্ঠে ওই কীর্তন শুনে সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরে যে ভাবতন্ময় ঘটে, তাতে তিনি দেশমাতৃকার ভাবনায় ভাবিত হন। ফলে এই সময়টি ‘বন্দে মাতরম্’ সংগীত রচনার পক্ষে একেবারেই উপযুক্ত।

‘আনন্দমঠ’ রচনার আগে বঙ্কিমচন্দ্র যে ‘বন্দে মাতরম্’ রচনা করেছিলেন এই সম্পর্কে পূর্ণচন্দ্রের লেখা ‘বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা’ শীর্ষক স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়— বঙ্গদর্শন সম্পাদনাকালে ওই পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকার একটি পৃষ্ঠাপূরণের প্রয়োজনের কথা সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রকে জানান। ওই সময় ঘরে টেবিলের উপর ‘বন্দেমাতরম্’ গান লেখা একটি পৃষ্ঠা দেখে কর্মাধ্যক্ষ জানান যে, এই গীতটি নেহাত মন্দ হবে না। সম্পাদক বিরক্ত হয়ে ওই কাগজটি সেই টেবিলের দেরাজের ভিতর রেখে দিয়ে কর্মাধ্যক্ষকে বলেছিলেন— ‘উহা ভালো কী মন্দ এখন তুমি বুঝিতে পারিবে না, কিছুকাল পরে উহা বুঝিতে পারিবে— আমি তখন জীবিত না থাকিবারই সম্ভব, তুমি থাকিতে পার।’ এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রের ছেলে ললিতচন্দ্র মিত্রর বর্ণনায়— ‘‘ ‘বন্দে মাতরম’ রচিত হইবার পরে বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে তদানীন্তন সুকণ্ঠ গায়ক ভাটপাড়ার স্বর্গীয় যদুনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় ইহাতে সুরতাল সংযুক্ত করিয়া প্রথম গাইয়াছিলেন। সেইদিন বিখ্যাত ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রের কার্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। কার্যানুরোধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কীসে ‘বঙ্গদর্শনে’র পৃষ্ঠা সত্বর পূরিত হয়, সেই দিকেই লক্ষ্য ছিল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, ‘গান যাহাই হউক, বন্দে মাতরম্ দ্বারা ‘বঙ্গদর্শন’-এর পেট ভরিবে না। আপনি একখানি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করুন।’ তদুত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র কহিয়াছিলেন, ‘এ গানের মর্ম তোমরা এখন বুঝিতে পারিবে না; যদি পঁচিশ বৎসর জীবিত থাক, তখন দেখিবে, এই গানে বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিবে।’’

বঙ্কিমচন্দ্রের বড়দাদা শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ছোটো ছেলে শচীশচন্দ্র ‘বঙ্কিম-জীবনী’ গ্রন্থে লিখেছেন--- ‘‘বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর দুই চারি বৎসর পূর্বে, একদা আমার ভগিনী (বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠকন্যা) তাঁহার পিতার নিটক ‘বন্দে মাতরম্’ গানের কথা তুলিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, ‘একদিন দেখিবে— বিশ ত্রিশ বৎসর পরে একদিন দেখিবে, সেই গান লইয়া বাঙ্গালা উন্মত্ত হইয়াছে— বাঙ্গালি মাতিয়াছে।’ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর কিছুদিন পরে আমি এই গল্পটি আমার ভগিনীর নিকট শুনিয়াছিলাম।’’

উপরিউক্ত তিনজন ব্যক্তির রচিত বক্তব্য থেকে দু’টি বিষয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া যায়। প্রথমত, বঙ্গদর্শন পত্রিকার একটি পৃষ্ঠা পূরণের প্রয়োজনে পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষকে সেই সময় কেবলমাত্র ‘বন্দে মাতরম্’ গানটি মুদ্রণের অনুমতি বঙ্কিমচন্দ্র দেননি।

দ্বিতীয়ত, ‘বন্দেমাতরম্’ গানটি রচনার পর বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং অনুভব করেছিলেন যে, এই গান আগামী কয়ক বছরের মধ্যেই স্বৈরাচারী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দেশের জনসাধারণকে উদ্দীপিত করতে পারবে।

বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পরেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্রকে ব্রিটিশ প্রশাসন আকস্মিক ভাবে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের সহ-সচিবের পদ থেকে সরিয়ে দেয়। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁকে বদলি করা হয় একজায়গা থেকে দূরবর্তী অন্য কোনো জায়গায়। যেহেতু তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার মতো পর্যাপ্ত তথ্য ছিল না সরকার বাহাদুরের হাতে, তাই পরোক্ষ শাস্তির পথ অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্রকে সরকারের অসন্তোষ সম্পর্কে অবগত করা হয়। তবে দেশীয় জনমানসে এই বিষয়ে যাতে কোনো ক্ষোভ-বিক্ষোভ সৃষ্টি না হয় সেই জন্যই সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে ‘অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি’ পদটি বিলোপ করা হয়েছে বলেই তাঁকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে।

ললিতচন্দ্র মিত্রের বর্ণনায় আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ‘বন্দে মাতরম্’ সংগীতের প্রথম সুরারোপ করেন বঙ্কিমচন্দ্রের সংগীত শিক্ষক সেকালের প্রখ্যাত ধ্রুপদশিল্পী যদুনাথ ভট্টাচার্য বা যদুভট্ট। শোনা যায় ‘আনন্দমঠ’ প্রকাশের আগে গোপালচন্দ্র ধর ও ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামে আরও দু’জন ব্যক্তি ‘বন্দে মাতরম্’ সংগীতের সুরারোপ করেছিলেন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মার্চ ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসটি। সংগীত পরিচালনায় ছিলেন সংগীতাচার্য দেবকণ্ঠ বাগচী। ওই দিন অভিনেত্রী ও গায়িকা বনবিহারিণীর নেতৃত্বে

ঝাঁপতালে নিবন্ধ তিলকামোদ রাগে সমবেতভাবে প্রথমবারের জন্য মঞ্চে গাওয়া হয় 'বন্দে মাতরম্' সংগীত। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ সাবিত্রী লাইব্রেরির পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের শেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের কণ্ঠে গেয়েছিলেন 'বন্দে মাতরম্'; সম্ভবত সেটিই প্রথম কোনো প্রকাশ্য সভার রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে প্রথমবার 'বন্দে মাতরম্' সংগীত পরিবেশন। সেই গানের সুর সংযোজনও করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। অমল হোম সম্পাদিত The Calcutta Municipal Gazette, Special Issue 1941-এ উল্লেখিত তথ্য থেকে জানা যায়, ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে উদ্বোধনের দিন রবীন্দ্রনাথ 'বন্দে মাতরম্' সংগীতটি পরিবেশন করেন। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ এপ্রিল প্রয়াত হন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এরপর ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশনে উদ্বোধন সংগীত হিসেবে 'বন্দে মাতরম্' গানটি পরিবেশন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রয়াণের পর এখন অবধি বহু জন বহু সুর দিয়েছেন, গানটি রেকর্ড করেছেন অসংখ্য সংগীত শিল্পী।

স্বাধীনতা সংগ্রাম যতই এগিয়েছে ততই 'বন্দে মাতরম্' গানটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে হাজার হাজার ভারতবাসীর আবেগ ও আত্মত্যাগের স্মৃতি। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য, ভারত ছাড়ো আন্দোলন-সহ পরাধীন দেশে ছোটো-বড়ো যাবতীয় সরকারি নীতিবিরোধী সংগ্রামে বিপ্লবীদের স্বদেশপ্রেমের সঞ্জীবনী মন্ত্রই ছিল এই 'বন্দে মাতরম্'। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের কথায়— '১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ এই দীর্ঘ ও দুঃসাধ্য স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের দেশপ্রেমী সন্তানদের যুদ্ধ নিনাদ ছিল 'বন্দে মাতরম্' এবং 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে তারা হাজারে হাজারে ব্রিটিশ পুলিশের লাঠির সামনে দাঁড়িয়েছে অথবা ফাঁসির মঞ্চে উঠে গেছে...'।

অথচ একটা সময়ে এসে, সম্পূর্ণ সংকীর্ণ রাজনীতির কারণে গানটিকে ঘিরে শুরু হয় নানান বিতর্ক। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' নীতির পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট ভারতীয় রাজনীতির নতুন প্রেক্ষাপটে লিগপন্থী মুসলমান সম্প্রদায় ক্রমশ পৌত্তলিকতার দোষে দুষ্ট 'বন্দে মাতরম্' গানটিকে দেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করার সপক্ষে তীব্র আপত্তি জানায়। কোনো কোনো সভায় মুসলমান ছাত্র ও জনতার আপত্তির দরুন এই গান প্রকাশ্যে গাওয়াই দুঃসাধ্য হয়ে উঠতে লাগল। তাঁদের কাছে উপরন্তু এই গানটি 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত আছে বলে 'বন্দে মাতরম্'কে আরও আপত্তিজনক বলে মনে হয়। শুরু হলো 'আনন্দমঠ'-এর বহ্ন্যুৎসব। কলকাতার রাজপথে প্রকাশ্যে পোড়ানো হয় স্তূপীকৃত 'আনন্দমঠ' গ্রন্থ। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে এবিষয়ে আলোচনা করে 'বন্দে মাতরম্' গানটির অঙ্গচ্ছেদ করে তা সর্বজনগ্রাহ্য হয় কিনা তার প্রচেষ্টা শুরু হয়। সিদ্ধান্ত হয়, 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী/কমলা কমলদল -বিহারিণী/ বাণী বিদ্যাদায়িনী/নমামি ত্বাং' অংশটি বাদ দিয়ে একে সকলের গ্রহণযোগ্য করা যায় কিনা। সুভাষচন্দ্র বসু তখন সদ্য বিদেশ থেকে ফিরে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কার্শিয়াঙে আছেন, সেখান থেকে ওই বছর ১৬ অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এবং ২০ অক্টোবর 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে এই বিষয়ে তাঁদের মতামত জানতে চান। জওহরলাল নেহরু তখন কংগ্রেস সভাপতি। তিনি ২৫ অক্টোবর ১৯৩৭ কলকাতায় এসে একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে আসেন। ২৬ অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ একান্ত সচিবের মাধ্যমে 'বন্দে মাতরম্' নিয়ে তাঁর অভিমত জওহরলাল নেহরুকে লিখে পাঠান। যেখানে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই বলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে তিনি নিজে এই 'বন্দে মাতরম্' গানের প্রথম দুটি স্তবক সুর দিয়ে তাঁকে গেয়ে শোনান এবং ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনেও তিনি ওই অংশটুকুই গেয়েছিলেন। ফলে ভারতীয় সংগীত হিসেবে 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রথম দুটি স্তবক গ্রহণ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমর্থন লাভের পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ২৮ অক্টোবর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জাতীয় সভাসমিতিতে 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া হলে গানটির প্রথম দুটি স্তবকই গাওয়া হবে। তবে এই গানটির পরিবর্তে অন্য কোনো সর্বজনগ্রাহ্য গান পরিবেশনের পূর্ণস্বাধীনতাও উদ্যোক্তাদের থাকবে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এই ঐতিহাসিক প্রস্তাবের মুসাবিদা করেন জওহরলাল নেহরু।

বঙ্গের তদানীন্তন সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা তখন এক সভায় মিলিত হয়ে 'বন্দে মাতরম্'-এর অঙ্গচ্ছেদের তীব্র নিন্দা করেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৭-এ 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের প্রথম দুটি স্তবক জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হলো ঠিকই কিন্তু মুসলিম লিগকে বিন্দুমাত্র সন্তুষ্ট করা গেল না। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে জিন্না যে এগারো দফা দাবি উত্থাপন করলেন, তার প্রথম দফাটিই ছিল : 'বন্দে মাতরম্' বর্জন। 'The Bande Mataram song to be given up'। এর প্রায় দশ বছর পর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর জওহরলাল নেহরু-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের এই গানের প্রতি ঔদাসীন্য আরও প্রকট হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার একটি অনুষ্ঠানে ভারতীয় প্রতিনিধিদের জাতীয় সংগীত পরিবেশ করার অনুরোধ করা হলে তাঁরা তৎকালীন ভারত সরকারের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে' গানটি পরিবেশন করেন। এরপর থেকে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর বাদ্যসংগীত এবং বিদেশি দূতাবাসের অনুষ্ঠানগুলিতে এই 'জনগণমন' গানই ব্যবহৃত হতে থাকে।

এই নিয়ে স্বভাবতই নেহরু সরকারকে সারা দেশে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে কেমব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ায় বলা হয়েছে— 'The greatest and

most enduring gift of the Swadeshi movement was Bande Mataram, the Uncrowned national anthem.' এই 'অনিভিষিক্ত জাতীয় সংগীতের অভিষেক' যখন দেশ প্রত্যাশা করছে তখন তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় অসন্তোষ দিকে দিকে পুঞ্জীভূত হতে থাকলো। গণপরিষদের অধিবেশনের শুরুতে সুচেতা কৃপালনীর কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্'-ই গাওয়া হয়েছিল। স্বাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত কোনটি হবে এই নিয়ে সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হতে থাকে।

গণপরিষদের একাধিক সদস্যের চাপে অবশেষে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ২৫ আগস্ট একটি বিবৃতি দিয়ে ঘোষণা করেন যে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে নিউইয়র্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার অধিবেশনে 'জনগণমন অধিনায়ক' গানের সুর বাদ্যযন্ত্রে বাজানো হয়েছিল, কারণ : 'there was no proper murical rendering of any other national song which we could send abroad.' তবে তিনি একথাও বলেন যে, ' 'Vande Mataram' is obviously and indisputably the premier national song of India, with a great historical tradition and intimately connected with our struggle for freedom. That position is bound to retain and no other song can displace it.'

অর্কেস্ট্রায় সুরযোজনার ক্ষেত্রে 'বন্দে মাতরম্'-এর অপেক্ষা 'জনগণমন' অধিকতর উপযোগী— এই সমস্যার সমাধানের জন্য 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সুরেশচন্দ্র মজুমদার এবং পুনার মাস্টার কৃষ্ণরাও তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় তাঁরা প্রমাণ করলেন যে, 'বন্দে মাতরম্'-ও অর্কেস্ট্রায় সাফল্যের সঙ্গে গীত হতে পারে। এই বাদানুবাদের নিরসনের জন্য গণপরিষদ একটি 'জাতীয় সংগীত নির্ধারণ কমিটি' গঠন করে। ওই কমিটি ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে সুপারিশ করে 'বন্দে মাতরম্' ও 'জনগণমন' এই দুটি গানকেই জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দেওয়া হোক। তবে এই কমিটি একথাও জানায় যে, 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া হবে কণ্ঠসংগীত হিসেবে। তবে এই বিষয়টি গণপরিষদের আলোচ্য সূচিতে থাকলেও শেষপর্যন্ত তা অনালোচিতই থেকে যায়। অবশেষে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর ভারতীয় সংবিধান রচনার কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার প্রায় দু-মাস পরে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি গণপরিষদের শেষ অধিবেশনে ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ পরিষদের সভাপতিরূপে একটি বিবৃতি দেন :

"The composition consisting of the words and music known as Janaganamana is the National Anthem of India subject to such alteration in the words as the Government may authorise as occasion arises ; and the song Vande Mataram' which was played a historic Part in the struggle for Indian Frendom shall be honoured equally with Janaganamana and shall have equal status with it (Applause). I hope this will satisfy the members."

উপরিউক্ত বিবৃতি অনুযায়ী 'জনগণমন' স্বাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত হলেও 'বন্দে মাতরম্' সমভাবেই সম্মানিত এবং 'জনগণমন'-র সমমর্যাদায় ভূষিত।

২০২২-এর ৫ নভেম্বর দিল্লি হাইকোর্টে এক জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া হলফনামায় বলা হয় "জাতীয় সংগীত ও জাতীয় স্তোত্রের মর্যাদা সমান। তাই প্রতিটি নাগরিকের উচিত 'বন্দে মাতরম্' ও 'জনগণমন'- এর প্রতি সমান সম্মান প্রদর্শন করা।"

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের সার্ধশতবর্ষের সূচনা হয় ২০২৪-এর অক্টোবরে আর এই বছর অক্টোবরে এর বর্ষপূর্তি। 'বন্দে মাতরম্'-এর সৃষ্টি, ব্যাপ্তি, নানা বিতর্ক পরিশেষে রাষ্ট্রীয় সংগীতের মর্যাদা প্রাপ্তি ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় যতটুকু ধারণা করা যায়, তা হলো এই গান হলো আমাদের জাতীয় প্রেরণা। যে গান কণ্ঠে নিয়ে অসংখ্য বীর বিপ্লবীর আত্মত্যাগ ও আত্মবলিদানের বিনিময়ে এসেছে আমাদের এই স্বাধীনতা। স্বাধীনতার ৭৯তম বর্ষে প্রতিটি ভারতীয় নাগরিককে যে অঙ্গীকারের শপথ নিতে হবে, তা হলো— রাষ্ট্রের স্বাধীনতার মর্যদা রক্ষা করার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সংগীতের মর্যাদাকেও যথোচিতভাবে রক্ষা করে চলার।

তথ্যসূত্র :

১. 'বন্দে মাতরম্' যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলিত, সম্পাদনা : বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়; সাহিত্যসংসদ; পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৯।

২. 'বন্দেমাতরম্ রচনাকাল ও রচনাক্ষেত্র কিছু অনুক্ত তথ্য' : পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়; বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র; পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৯।

৩. পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬১।

৪. পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৭।

৫. 'বন্দে মাতরম্' : ললিতচন্দ্র মিত্র; 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ'; নবপত্র প্রকাশন; পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৭০।

৬. 'বঙ্কিম-জীবনী' : শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; পুস্তক বিপণি; পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২১৬।

৭. 'উপশাসকের বিপন্ন পৃথিবী বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর সময়' : উৎপল চক্রবর্তী; বঙ্কিম ভবন-গবেষণা কেন্দ্র; পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬৯।

৮. পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৭১।

৯. পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৭২।

১০. 'বন্দে মাতরম্' একটি গানের আশ্চর্য কাহিনী' : রমা কুণ্ডু; রেডিয়্যান্স; পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৭।

১১. 'বন্দে মাতরম্' : জগদীশ ভট্টাচার্য; দে'জ পাবলিশিং; পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৮৯।

১২. 'বন্দে মাতরম্' : জগদীশ ভট্টাচার্য; দে'জ পাবলিশিং; পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৯৫।

১৩. 'বন্দে মাতরম্' : জগদীশ ভট্টাচার্য; দে'জ পাবলিশিং; পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৯৫।

১৪. 'বন্দে মাতরম্'-এর সুর : উৎস ও বৈচিত্র্য : অনন্তকুমার চক্রবর্তী; বঙ্কিম-ভবন-গবেষণা কেন্দ্র; পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৩।

১৫. 'বর্তমান'; সংবাদপত্র; ৬ নভেম্বর, ২০২২।

(ঋণ-স্বীকার : 'ঐশী'; দ্বাদশ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, ১৪৩২)

(লেখক কিউরেটর, বঙ্কিম ভবন গবেষণা কেন্দ্র, কাঁটালপাড়া, নৈহাটি) ▯

বন্দেমাতরম

‘এক অবিরাম দেশশ্লোক’

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

মল্লার রাগ, কাওয়ালি সুর। তারপর রবি ঠাকুরের ছোঁয়ায় তা নবজন্ম নিল ‘দেশ’ রাগে। সাহিত্য সৃষ্টির আঙিনা টপকে যে গান হলো দেশপ্রেমের সুর, বিদ্রোহের শিখা, স্বাভিমানের আগুন। যা শ্রীমদ্‌ভগবতগীতার মতো পবিত্র, যা তেজের প্রতীক, যা ত্যাগের প্রতীক— তাই-ই আসলে বন্দেমাতরম। এ কোনো ধ্বনি নয়, এ স্বদেশি অনুরণন। এ কোনো স্লোগান নয়, এ চিত্ত বিশুদ্ধ চিরন্তন বিশ্বাস। সুভাষচন্দ্র বসু অনুরোধ করলেন তিমিরবরণ ভট্টাচার্যকে, এই তেজসুর বন্দেমাতরমকে ‘রাগ দুর্গা’তে সুরারোপ করতে। আজাদ হিন্দ ফৌজ সিঙ্গাপুর থেকে যখন তার গঠন প্রস্তাব রাখল তখনও সিঙ্গাপুর রেডিয়ো মার্চিং স্টাইলে বন্দেমাতরম প্রচার করল। বন্দেমাতরম দেশপ্রেমের ভক্তিতে জারিত। তাই ১৯০১ কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে বন্দেমাতরম পরিবেশন করলেন দক্ষিণাচরণ সেন। রবি ঠাকুর যেন দেশপ্রেম যাপন করেছেন বন্দেমাতরমে। তাই ১৯০৪-০৫ রবি ঠাকুরের কণ্ঠে বন্দেমাতরম গ্রামোফোন কোম্পানি প্রকাশ করল। ১৯০৫ সালে সরলাদেবী চৌধুরাণী বারাণসী কংগ্রেস অধিবেশনে পরিবেশন করলেন এক মন্ত্রগীত। ১৯০৫ সালে হীরালাল সেন এক রাজনৈতিক চলচ্চিত্র নির্মাণ করলেন যার সমাপ্তিতে বন্দেমাতরম। ১৯০৭ সালে মাদাম ভিখাজি কামা ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকায় দেবনাগরীতে লিখলেন ‘বন্দেমাতরম’। ১৯০৯, ২০ নভেম্বর, ইংরেজিতে ঋষি অরবিন্দ অনূদিত বন্দেমাতরম— ‘Mother, I bow to thee’ প্রকাশিত হয় ‘কর্মযোগিন’ পত্রিকায়। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর স্কুলে বন্দেমাতরমকে করলেন প্রার্থনা সংগীত। দেশ স্বাধীন হলো, সকাল ৬টা ৩০ মিনিট, ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের জলদগম্ভীর কণ্ঠে প্রচারিত হলো বন্দেমাতরম।

রাজপথ থেকে গলি, পাড়া থেকে জেলখানা, আন্দোলন থেকে ফাঁসির মঞ্চ, অত্যাচার থেকে উদ্বুদ্ধ উদ্বোধনে যদি সবার কোনো সাধারণ ভাষা থাকে, সাধারণ মনের অক্ষর থাকে, যদি দেশমাতৃকাকে সম্বোধন করার কোনো যথাযথ বাণী থাকে তবে তা নিশ্চিত ভাবেই বন্দেমাতরম। যার বিকল্প সে নিজেই। বঙ্গদর্শন পত্রিকার কর্মীকে বঙ্কিমচন্দ্র আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলছিলেন, ‘একদিন দেখবে, দেশ এই গানে মেতে উঠেছে। সেদিন আমি থাকব না, কিন্তু তুমি দেখে যেতে পারবে।’ তখন কিন্তু আনন্দমঠ প্রকাশিতই হয়নি। কাগজে খানিক জায়গা বাকি ছিল নীচের দিকে। ফাঁকা না রেখে প্রথম দু-লাইন প্রকাশিত হোক! তারপর তা হলো আগুন, তা হয়ে উঠল বিদ্রোহ, তা হয়ে উঠল স্বাধীনতা আন্দোলনের মন্ত্র। যখন নিষিদ্ধ হলো তখন তার জোর আরও বাড়ল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন আর বন্দেমাতরম যেন একে অন্যের জন্য গেঁথে গেল এক তালে। তবে একটা গানকে স্লোগানে রূপান্তরিত করলেন সরলা দেবী। অবলা বসু, সরলা দেবী স্বদেশি আন্দোলনে ময়মনসিংহ সুহৃদ সমিতির মিছিলে যে উদাত্ত বন্দেমাতরম ধ্বনি দিলেন তা আসমুদ্রহিমাচলের প্রতিটা স্বাভিমানী ভারতীয়র স্পন্দনে জোয়ার আনল। মদনলাল ধিংড়া, প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম বসু, মাস্টারদা সূর্য সেন, মাতঙ্গিনী হাজরা সবার ব্রহ্ম সুর হয়ে উঠল বন্দেমাতরম। এই ধ্বনির অপরাধে গ্রেপ্তার কত বিপ্লবী। এই ধ্বনির জোরেই তাঁরা বল পেয়েছেন। এই ধ্বনির জোরেই পরবর্তী প্রজন্মের বিপ্লবী তৈরি হয়েছে।

ইংরেজ শাসনে ভারতজুড়ে তখন হাহাকার। প্রদেশে প্রদেশে যন্ত্রণা। দুর্ভিক্ষ। চলছে মহাবিদ্রোহ এবং আরও অনেক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আন্দোলন। কিন্তু কোথাও যেন এক সূত্রে জাতিকে, ভারতের সব সন্তানকে বাঁধার অভাব। হয়তো সেই অভাবের তাড়নাতেই তৈরি হলো আনন্দমঠ। ভবানন্দ জন্ম নিল সর্বাপেক্ষা তেজোদ্দীপ্ত স্বদেশ মন্ত্রে। বঙ্গদর্শনে ১৮৮১ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেতে শুরু করে আনন্দমঠ। শেষ কিস্তি ছিল ১৮৮২, মে। অর্থাৎ এক বছরের মধ্যে বঙ্গিমচন্দ্রের দেশরাগ শিল্পরূপ পেল। সেই শিল্পই হয়ে উঠল বিক্ষোভের লেলিহান শিখা। বাইরে থেকে মানুষের যন্ত্রণা বঙ্কিম মনে এতটাই আঘাত করেছিল, যা তাঁর ভিতরে এক ভবানন্দের জন্ম দিল। রবি ঠাকুর তাই বলছেন, “আমার কাছে এই জন্যই তো সমস্তটা একটা unreal phantasmagoria বলিয়া মনে হয়; জঙ্গলের মধ্যে এই ছায়াবাজির কোথাও একটু সমাজের সহিত নাড়ির সম্বন্ধ দেখিতে পাই না।

স্বীকার করি, এই সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ঐতিহাসিক সত্য; কিন্তু সেই ভিত্তিটুকুর উপর বঙ্কিমবাবু যে রোমান্সটি গড়িয়া তুলিলেন, কেন তিনি তাহাতে দেখাইতে চেষ্টা করিলেন না যে কেমন করিয়া কতকগুলো লোক আর অল্পে অল্পে তিলে তিলে সাংসারিক সমস্ত বিচ্ছেদ ব্যবধান অপসারিত করিয়া, একটা আইডিয়ায় অনুপ্রাণিত হইয়া পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইল? একেবারে সমস্তটা খাড়া করিয়া হঠাৎ আমাদের চোখের সামনে ধরিলেন। কত অত্যাচার, উৎপীড়ন, কত বেদনা, কত নিষ্ফল প্রয়াসের ভিতর দিয়া এই বিপ্লবী বীজ অঙ্কুরিত হইল, তাহার আভাসমাত্রও পাইলাম না। একেবারে বিদ্রোহের ছবি, সংসার হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।"

আনন্দমঠ এবং তাতে ভবানন্দের গাওয়া বন্দেমাতরম আসলে এক বোধের আকুতি, দেশ মর্যাদার প্রতি মাথানত করার সুর, আত্মমর্যাদায় সুশৃঙ্খল স্বাধীনতার সত্যদীপ প্রজ্বলিত করার ব্রত। ইংরেজ সরকারের ঔদ্ধত্য ও উদাসীনতার বিরুদ্ধে এ হয়ে উঠল এক প্রতিবাদ। বিপ্লবীদের প্রজ্বলিত করেছে আনন্দমঠ ও বন্দেমাতরম। আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন, 'যে সব সন্ন্যাসী ফকিরেরা' সত্য ইতিহাসের লোক, তাহারা... সকলেই নিরক্ষর, ভগবদ্‌গীতার নাম পর্যন্ত জানিত না।' অর্থাৎ এই মন্ত্রই সবাইকে দেশরাগে বাঁধল। আদর্শ সন্তান তৈরি হলো বন্দেমাতরমে। তা কখনও ভক্তি, কখনও যোগ, কখনও-বা বিদ্রোহ। প্রাণবন্ত হয়ে উঠল বন্দেমাতরম। বন্দেমাতরম মানে রাজরোষ। বন্দেমাতরম মানে ইংরেজ সরকারকে চ্যালেঞ্জ করা। ইংরেজ নিন্দা থেকে অসন্তোষ— সব ভাব প্রকাশের ভাষা হলো বন্দেমাতরম।

ভবানন্দের কথা আছে আনন্দমঠে, তিনি বলছেন 'আমরা অন্য মা মানি না। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি জন্মভূমিই জননী। আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা,— 'ভবানন্দ গেয়ে ওঠেন বন্দেমাতরম।'

বন্দেমাতরম এক অসমান্তরাল দেশবোধের আল্পনা। একে মাপা, ব্যাখ্যা করা মূর্খতা। কারণ এই গান জাতির মেরুদণ্ড গড়েছে। ভারতের বুকে যে যেই ধারার রাজনীতিই করুক, বন্দেমাতরম হোক সবার মন্ত্র। ভূখণ্ড দেশ হয় এই তালে তালে সুরে অগ্নি দ্রোহে। বিপিন চন্দ্র পাল বন্দেমাতরম পত্রিকায় ১৯০৭-এ 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' নামে যে নিবন্ধ প্রকাশ করেন তাতে বলেন, 'Among the Rishis of the later age we have at least realised that we must include the name of the man who gave us the reviving Mantra which is creating a new India, the Mantra BandeMataram... The religion of patriotism, this is the master idea of Bankim's writings... of the new spirit which is leading the nation to resurgence and independence, he is the inspirer and political Guru... The third and supreme service of Bankim to his nation was that he gave us the vision of our Mother.' এই শেষ শব্দ গুলিই লাখ কথার এক কথা— Vision of our Mother বোধের পূর্ণ শশীরূপ আমরা পেতাম না যদি 'বন্দেমাতরম' আমাদের চেতনা চৈতন্য বিশ্বাস বিদ্রোহে অঙ্গীভূত না হতো। আনন্দমঠের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র কী চমৎকার লিখছেন, 'বিষ্ণু মণ্ডপ জনশূন্য হইল। তখন সহসা সেই বিষ্ণু মণ্ডপের দীপ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল; নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিলেন তাহা সহজে নিবিল না...' ---রাজদ্রোহোদ্দীপক বন্দেমাতরম আবহমানকাল ধরে তেজোদ্দীপ্ত। পৃথিবীর কোনো সঙ্কট তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তা সবার চেতনার বিচ্ছুরণ। চরমপন্থী রাজনীতির সূতিকাগৃহ বন্দেমাতরম। ১৯০৮, ২৯ জানুয়ারি, অমরাবতী ভাষণে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ বলছেন বন্দেমাতরম গান নয়, মন্ত্র। এক শক্তি। কালী মাতার কাছে নিবেদিত এই গান হয়ে উঠল জাতীয়তাবোধের প্রতীক। চরমপন্থীর রণহুঙ্কার বন্দেমাতরম। ১৯০৬, ১৮ নভেম্বর, বোম্বেতে বাল গঙ্গাধর তিলকের সভাপতিত্বে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বন্দেমাতরম আমাদের জাতীয় ধ্বনি'। বিনয়কুমার সরকার এই মন্ত্রের এক অনন্য ব্যাখ্যা দিলেন। তাঁর মতে 'বন্দেমাতরম মন্ত্রের দেবী মামুলি হিন্দু দেব-দেবীর অন্যতম নন। এই দেবী জলমাটির দেবী, পাহাড়ের দেবী, নদ-নদীর দেবী, দেশ দেবী, বঙ্গদেশ। নয়া আধ্যাত্মিকতার ফোয়ারা ছুটছে এই মন্ত্র থেকে। অথচ ইহার ভিতর বেদ-পুরাণ-তন্ত্রের নামগন্ধ নাই। বন্দেমাতরম হিন্দু আধ্যাত্মিকতার মন্ত্র, ভক্তিমার্গীক নাস্তিকতার সুরা। এই মন্ত্রে কঁৎ-পন্থী বঙ্কিম দর্শনের সমাজসেবা বা মানব পূজা সরস মূর্তি পেয়েছে। স্বদেশ পূজা প্রবর্তক বঙ্কিম নবীন আধ্যাত্ম জীবনের ভগীরথ।'

বিপিন চন্দ্র পাল অনবদ্য ভাষণে বলেন, 'বন্দেমাতরম গান নহে, মন্ত্র। প্রত্যেক মন্ত্রের একজন ঋষি ও এক বা ততোধিক দেবতা থাকেন। বন্দেমাতরম মন্ত্রের ঋষি সন্তান-সম্প্রদায়। প্রবর্তক মহাপুরুষ। পুরোহিত বঙ্কিমচন্দ্র। দেবতা জন্মভূমি। মন্ত্র অনেক সময় স্বল্প বর্ণাত্মক হয়। বিশেষ যে মন্ত্র সাধনা করিতে হয়, যে মন্ত্র সাধকের জপ মন্ত্র হইবে, সাধক যাহা নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে, শয়নে স্বপনে জপিবেন। জপিতে জপিতে তন্ময় হইয়া, আপনাকে সেই মন্ত্রের অগাধ রসে একেবারে ডুবাইয়া রাখিবেন, এমন সিদ্ধমন্ত্র প্রায়ই অতি সংক্ষিপ্ত, অতি স্বল্প পরিসর হওয়া আবশ্যক। বন্দেমাতরম এই শব্দ দুটিই এজন্য প্রকৃত মন্ত্র। যে শক্তিশালী সঙ্গীতের শিরোভাগে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সমগ্রটা মন্ত্র নহে।...বন্দেমাতরম মন্ত্র; কারণ এই মন্ত্র ভক্তিরূপে জপ করিলে মায়ের স্বরূপ চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে...'। অনুশীলন সমিতি এই গান, এই মন্ত্রকে বিদ্রোহ সঙ্কেতের মতো যাপন করেছে। দেশ সঞ্জীবনী সঙ্গীত যদি কিছু হয় তবে তা বন্দেমাতরম। রণহুঙ্কার বন্দেমাতরম। মাতৃ আরাধনাও বন্দেমাতরম। দেশপ্রেম ভিক্ষাচর্যের মন্ত্র বন্দেমাতরম। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার মাভৈঃ তান বন্দেমাতরম। এ বিজয়ধ্বনি। এ এক অবিরাম দেশশ্লোক।'

কংগ্রেস শুধু দেশকে দ্বিখণ্ডিত করেনি, স্বাধীনতা সংগ্রামের স্তবমন্ত্র বন্দেমাতরম্‌কেও খণ্ডিত করেছে

এত মহাপুরুষের সম্মিলিত প্রণতি ও বন্দনাই তো হলো বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সংগীত। আমরা ভারত সন্তানরা যদি আবার দেশমাতৃকাকে তার রত্নসিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাই তবে সবার আগে চাই তাঁর স্তবমন্ত্র বন্দেমাতরমের পুনর্জাগরণ। স্বমহিমায় তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

আজ থেকে ঠিক ১৫০ বছর আগে এক স্বপ্নদ্রষ্টা ঋষির অন্তরের মাতৃচেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল এক কবিতার মাধ্যমে। সেই কবিতার স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমগ্র জাতিকে শিখিয়েছেন দেশ মানে কেবল একখণ্ড ভূমি নয়, দেশ হলো মাতৃস্বরূপা, সিংহবাহিনী দশভুজা, মৃন্ময়ী আধারে চিন্ময়ী সত্তা। আর আমাদের কণ্ঠে দিয়েছেন দেশ জননীর স্তবমন্ত্র বন্দেমাতরম। এই সংগীত স্বাধীনোত্তর ভারতের প্রথম জাতীয় সংগীত। কী ছিল বন্দেমাতরম্ রচনার ইতিহাস?

সেটা ছিল ১৮৭৫ সাল। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদক। পত্রিকা ছাপার কাজ চলছে। সন্ধ্যাবেলা। এমন সময় প্রেসের এক ছাপা কর্মী এসে বললে— 'বাবু, আরও কিছুটা ম্যাটার চাই'। বঙ্কিমচন্দ্র কিঞ্চিৎ বিব্রত। হাতের কাছে প্রকাশযোগ্য কোনো লেখা দেখতে পেলেন না। তিনি দেরাজ হাতড়াতে লাগলেন। হঠাৎ হাতের কাছে পেলেন একটা কাগজ। কাগজটা টেনে নিয়ে চোখ বুলালেন। তার নিজেরই লেখা একটি কবিতা। মনে দ্বিধা, না এটা তো ছাপা চলে না। এ যে তার গোপন মনের অন্তরতম পূজার মন্ত্র। প্রকাশ্য জনতার মাঝে তাকে টেনে আনা কি উচিত? কিন্তু প্রেসের লোক তখনও দাঁড়িয়ে। নিতান্ত বাধ্য হয়ে কাগজখানা তুলে দিলেন তার হাতে— 'যাও, কম্পোজ করে নিয়ে এসো'। চলে গেল লোকটি। হাতে নিয়ে গেল আগামীদিনের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহামন্ত্র রাষ্ট্রবন্দনা 'বন্দেমাতরম্'।

পরের দিন বঙ্গদর্শনে বন্দেমাতরম্ ছাপা হলো বটে কিন্তু জনমনে সে কবিতা কোনো দাগ কাটলো না। হাজার বছর ঘুমে অচেতন যে জাতি তার প্রাণে কি ওই ডাক এত সহজে সাড়া জাগাতে পারে? একদিন বৈঠকি আড্ডায় তখনকার দিনের নামজাদা সাহিত্যিক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ জমিয়ে গল্প করছেন। কথাপ্রসঙ্গে উঠলো বন্দেমাতরমের নাম। নবীন সেন বললেন— 'এটার ভাষা খারাপ নয়, কিন্তু আধা সংস্কৃত, আধা বাংলা, জগাখিচুড়ি করে সব মাটি হয়ে গেল। এ যেন যাত্রাদলের গোবিন্দ অধিকারীর গানের মতো'। মর্মাহত হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বিশেষত নবীন সেনের মতো প্রাজ্ঞ কবির কাছে এমন তাচ্ছিল্যকর উক্তি তিনি আশা করেননি। ১৮৮৩ সাল। প্রকাশিত হলো তার কালজয়ী উপন্যাস আনন্দমঠ। বন্দেমাতরম্‌কে তিনি অন্তর্ভুক্ত করলেন আনন্দমঠে। যেখানে স্বদেশপ্রেমে দীক্ষিত সন্তানদল বলছে— 'আমরা অন্য মা জানি না। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি জন্মভূমি জননী। আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই,

বন্ধু নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর-বাড়ি নাই। আমাদের আছে কেবল সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা শস্য শ্যামলা জন্মভূমি।

তখনও বন্দেমাতরম্ জাতির জীবনে তেমন কোনো রেখাপাত করতে সক্ষম হলো না। ১৮৯৪ সাল একবুক ব্যথা নিয়ে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মেয়েকে বলেছিলেন— 'তোরা দেখে নিস, আজ থেকে বিশ-ত্রিশ বছর পর এই বন্দেমাতরম্ই সারা দেশের মানুষের বুকের রক্তে নাচন আনবে।' ১৮৯৪ সালের কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে সুর দিয়ে গাইলেন বন্দেমাতরম্। কিন্তু তখনও এ গান জাগ্রত মন্ত্রশক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে উঠতে পারেনি। কেটে গেল আরও নয়টি বছর। স্বদেশের মাতৃমূর্তি গড়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র, কিন্তু তখনও তাতে যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়নি। এবার সামনে এলেন জাতির মহাঋত্বিক স্বদেশে আত্মার বাণীমূর্তি শ্রীঅরবিন্দ। বললেন, 'বন্দেমাতরম্ আমাদের মাতৃরূপ দর্শন করিয়েছে। একদিনে একটি সমগ্র জাতি স্বদেশপ্রেমের ধর্মে পরিবর্তিত হয়েছে। যতদিন না মায়ের মন্দির নির্মাণ, আর বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয় ততদিন এজাতির বিশ্রাম নেই, শান্তি নেই, নিদ্রা নেই'। এবার হলো প্রাণপ্রতিষ্ঠা। শুষ্ক নদীবক্ষে এলো শ্রাবণের জোয়ার। সত্যি হলো বঙ্কিমের ভবিষ্যদ্‌বাণী। ধীরে ধীরে বন্দেমাতরম্ হয়ে উঠলো জাতির সঞ্জীবনী মন্ত্র।

১৯০৫ সাল। ভারতের রাজধানী তখন কলকাতা। স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ বঙ্গপ্রদেশের গ্রামে-নগরে, ঘরে-বাইরে সর্বত্র। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে শাসকের ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। বঙ্গের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে ছিন্নভিন্ন করতে কুচক্রী ইংরেজ শাসক ভাইসরয় কার্জন প্রস্তাব দিলেন বঙ্গকে ভাগ করার। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল সারা দেশ। প্রতিরোধ শুরু হলো। জন্ম নিল 'স্বদেশী আন্দোলনের'। আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়তে লাগলো বিদেশি দ্রব্যের পাহাড়। বঙ্গের আকাশ-বাতাস তখন মুখরিত বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে। অবশেষে এলো ১৬ অক্টোবর। দুই বঙ্গকে ভাগ করার দিন। ঘরে ঘরে সেদিন অরন্ধন। মেয়েরা ঘট পেতে বঙ্গলক্ষ্মীর পূজা করে সংকল্প নিল 'মা লক্ষ্মী কৃপা কর। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ কিনবো না, ঘরের থাকতে পরের জিনিস নেব না, পরের দুয়ারে ভিক্ষা করব না, মোটা অন্ন অক্ষয় হোক, ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুক।' রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' শব্দকে নিয়ে গান বাধলেন, 'বন্দেমাতরম্, একই সূত্রে গাঁথিয়াছি সহস্রটি মন'। সেই গান গেয়ে গঙ্গার ঘাটে স্নান করে সবার হাতে বেঁধে দিলেন রাখি। সকলের কণ্ঠে তখন বন্দেমাতরম্ উদ্ঘোষ। সেই শুরু। সেদিন থেকে বন্দেমাতরম হয়ে উঠলো বিপ্লবী আন্দোলনের বোধন মন্ত্র। ধীরে ধীরে ব্রিটিশ সরকারের কাছে বন্দেমাতরম হয়ে উঠল এক আতঙ্ক। ব্রিটিশ প্রশাসন 'রিসলে সার্কুলার' জারি করে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি নিষিদ্ধ করে দিল।

এতে কি আর ছেলের মুখ থেকে মায়ের নাম কেড়ে নেওয়া যায়? নাগপুরের নীলসিটি হাইস্কুল। ক্লাসের ছাত্ররা স্কুল ইন্সপেক্টরকে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানালো। এই অপরাধে ছাত্র নেতা কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারকে স্কুল থেকে বিতাড়িত করা হলো। কিন্তু বন্দেমাতরম্ বন্ধ করা গেল না।

১৯০৬ সাল। বরিশালে কংগ্রেসের অধিবেশন। বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে মুখরিত সভা লাঠিচার্জ করে ভেঙে দিল পুলিশ। চারিদিকে রক্তাক্ত মানুষের হুড়োহুড়ি। তারই মাঝে দাঁড়িয়ে বালক চিত্তরঞ্জন হাতের মুঠি আকাশে তুলে ধ্বনি দিচ্ছে 'বন্দেমাতরম্'। মুহূর্তে পুলিশের লাঠি এসে পড়ল মাথায়। লুটিয়ে পড়ল চিত্ত। কিন্তু বন্দেমাতরম্ বন্ধ হলো না। পরে চিত্ত তার বাবাকে বলেছিল, 'বাবা, পুলিশ যতবার আমাকে লাঠি মেরেছে, আমি ততবার বন্দেমাতরম বলেছি, ওরা আমাকে চুপ করাতে পারেনি'।

১৯০৭ সাল। বিপিনচন্দ্র পালকে স্বাগত জানাতে কয়েক হাজার মানুষ কোর্টে উপস্থিত। চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠলো 'বন্দেমাতরম্'। শুরু হলো নির্মম লাঠিচার্জ। এই অন্যায় সহ্য হলো না ছাত্র সুশীল সেনের। সার্জেন হুইকে লাগালেন এক ঘুঁসি। গ্রেপ্তার হলো সুশীল। ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড আদেশ দিলেন ১৫ ঘা বেত মারার। পিঠে বেত পড়তে থাকলো আর প্রত্যেকটি বেত্রাঘাতের প্রত্যুত্তরে সুশীলের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো— 'বন্দেমাতরম্'।

১৯০৯ সালের ১ জুলাই। লন্ডনের জাহাঙ্গির হলে ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক উৎসব। সবাই অনুষ্ঠানে বিভোর। হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হলেন মদনলাল ধিংড়া। গর্জে উঠলো তার হাতের পিস্তল। কার্জন উইলি লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। ধরা পড়লেন মদনলাল। বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে ফাঁসির দড়ি চুম্বন করার আগে মদনলাল তার শেষ ইচ্ছা জানিয়ে বলেছিলেন, 'আমি যেন বারে বারে আমার গর্ভধারিণীর বুকে জন্মগ্রহণ করে দেশ উদ্ধারের সাধনায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি, যতদিন না আমার ভারতভূমি সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে বিশ্বসভায় গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হন— 'বন্দেমাতরম্'।

যে বন্দেমাতরম্ মন্ত্র এদেশের স্বদেশি আন্দোলনের প্রেরণার উৎসধারা ছিল, যে বন্দেমাতরমের বলে বলীয়ান হয়ে ক্ষুদিরাম- প্রফুল্ল চাকী-বাঘাযতীন-মাস্টারদা সূর্যসেন-মাতঙ্গিনীরা এই বঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসীম বীরত্বে লড়াই করেছেন; যে বন্দেমাতরমের অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে চট্টগ্রামের সপ্তদশী প্রীতিলতা নির্দ্বিধায় সায়ানাইডের ক্যাপসুলটা দাঁতে কেটে পাহাড়তলির মাটিতে মুখ গুঁজে পড়েছিলেন; যে বন্দেমাতরমের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে ১৪-১৫ বছরের লোকনাথ টেগরা-মনোরঞ্জন সেনরা ব্রিটিশ সেনার বিরুদ্ধে কাঁপিয়ে দিয়েছিল জালালাবাদের পাহাড়; যে বন্দেমাতরমের তেজে বলীয়ান হয়ে বিনয়-বাদল-দিনেশ রাইটার্সের অলিন্দকে ব্রিটিশ শাসকের রক্তে রাঙিয়ে দিয়েছিলেন; যে বন্দেমাতরম্কে বুকে নিয়ে ভগৎ-সুখদেব-রাজগুরুরা ফাঁসির আগের দিন রাত্রে লাহোরের কনডেমড্ সেলে বসে প্রাণভরে গেয়ে উঠেছিলেন 'মেরে রংদে বাসন্তী চোলা'; যে বন্দেমাতরম্কে বুকে ধরে বঙ্গের বীর যতীন দাস লাহোরের সেন্ট্রাল জেলে ৬৩ দিন অনশন করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন; যে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রকে জপ করতে উল্লাসকর-বটুকেশ্বর-সাভারকরেরা আন্দামান সেলুলার জেলের অন্ধ কুঠুরিতে বছরের পর বছর অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেছিলেন— সেই বন্দেমাতরম্ মহামন্ত্রের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস কী করেছিল তা জানতে হবে সবাকে। অনেকেরই হয়তো তা জানা নেই সে কথা।

১৯২৩ সাল। কংগ্রেসের কাকিনাড়া অধিবেশন। মঞ্চে আমন্ত্রিত সেই সময়কার প্রখ্যাত শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পী বিষ্ণু দিগম্বর পলুস্কর। সভার শুরুতেই তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ গাইতে শুরু করলেন। তীব্র প্রতিবাদ জানালেন মঞ্চে উপবিষ্ট মৌলানা মহম্মদ আলি ও তার ভাই শওকত আলি। দাবি তুললেন কংগ্রেসের মঞ্চে এ গান গাওয়া যাবে না।

থেমে গেলেন বিষ্ণুজী। কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা তখন তাঁকে শুধুমাত্র গানটির প্রথম স্তবক গাইবার অনুরোধ করলেন। বিষ্ণুজী বললেন, 'গাইলে পুরোটাই গাইবো, নইলে গাইবো না'। জনতার চাপে নতিস্বীকার করল কংগ্রেস। বিষ্ণুজী তার সুললিত কণ্ঠে সম্পূর্ণ করলেন বন্দেমাতরম্ সংগীত। আলি ভ্রাতৃদ্বয় বন্দেমাতরমকে অপমান করে মঞ্চ ছেড়ে চলে গেলেন। সেদিন থেকে মুসলমানরা সরাসরি বন্দেমাতরমের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে লাগল। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র এই গানে দেশকে মা বলেছেন। বলেছেন, 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী, কমলাকমলদল বিহারিণী, বাণী বিদ্যাদায়িনী'

—অর্থাৎ এই দেশ হলো স্বয়ং দশভুজা দুর্গা, মা লক্ষ্মী, মা সরস্বতী। ইসলামি সাম্প্রদায়িকতার কাছে মাথা নোয়ালো কংগ্রেস। নেতারা বললেন, 'কেউ যদি ব্যক্তিগত কারণে বন্দেমাতরম্ গাইতে না চান, তাকে শ্রদ্ধা জানাতে না চান, তবে তার সেই স্বাধীনতা থাকা উচিত'। ১৯৩৭ সালে গান্ধীজী ও জওহরলালের নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস সম্পূর্ণ বন্দেমাতরমের স্থানে কেবলমাত্র এর প্রথম দুটি স্তবককে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দিল। আর বাদ দিল সেই স্তবকগুলিকে যেখানে দেশমাতৃকাকে 'মা দুর্গা' বলে প্রণাম জানানো হয়েছে। খণ্ডিত হলো বন্দেমাতরম্ মন্ত্র। ইসলামি সাম্প্রদায়িকতার যূপকাষ্ঠে বন্দেমাতরমকে বলি দিল কংগ্রেস।

তবে এত বড়ো পাপ সহ্য করেননি ঈশ্বর। যে বন্দেমাতরমের অপার শক্তি ১৯০৫ সালে বড়লাট কার্জনের বঙ্গবিভাগের 'সেটেলড্-ফ্যাক্টকে' আনসেটেল করে দিয়েছিল, সেই বন্দেমাতরমকে খণ্ডিত করার পাপে মাত্র ১০ বছরের মাথায়, ১৯৪৭ সালে দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। যতদিন আমরা বন্দেমাতরমকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বুকে আগলে রেখেছিলাম ততদিন দেশ অখণ্ড ছিল। কিন্তু যেই আমরা বন্দেমাতরমকে ভেঙে টুকরো করে দিলাম, দেশের শত্রুদের আবদারের কাছে মাথা নত করলাম, মায়ের পূজার মন্ত্রকে কেটে ফেললাম, সেদিন থেকে আমাদেরও পতন শুরু হলো।

হিন্দুদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকা যায় না তাই মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ পাকিস্তান চাই, এই দাবিকে হাতিয়ার করে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হলো। কিন্তু যে সাম্প্রদায়িকতার কাছে মাথা নত করে কংগ্রেস দেশভাগ মেনে নিল সেই সমস্যার সমাধান আজও হলো না। স্বাধীনতার পরও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতে বন্দেমাতরম্ খণ্ডিতই রয়ে গেল। আজও এদেশে বন্দেমাতরম্ বিরোধী ইসলামি মোল্লাবাদীরা সমানভাবে সক্রিয়। ১৯২৩ সালের মহম্মদ আলি, শওকত আলিরা আজকের যুগের আজম খান, আসাদুদ্দিন হয়ে জন্ম নিয়েছে। ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে নির্দ্বিধায় যারা বলতে পারে, ''আমার চোখে ভারত 'ভারত মাতা' নয়, ডাইনি''। কেউ-বা আবার দম্ভের সঙ্গে বলে, 'গলায় চাকু রেখে বললেও আমি বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ করব না'। কমিউনিস্টরা কোনোদিনই বন্দেমাতরম্ শব্দ উচ্চারণ করেনি। করবেই-বা কী করে? তাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-নেতা মুজফফর আহমেদ (কাকাবাবু) যে বলে গেছেন, 'বন্দেমাতরম্ হলো হিন্দুদের দেবী দুর্গার উদ্দেশ্যে একটি প্রার্থনা। একেশ্বরবাদী মুসলমানেরা কখনোই এটি উচ্চারণ করতে পারে না।' অর্থাৎ এদেশে এখনো অনেক ভারতমাতার অপমানকারীরা রয়ে গেছে। এদের মন পেতেই ১৯৫০ সালে কংগ্রেসের ভারতীয় গণপরিষদে খণ্ডিত বন্দেমাতরম্‌কে জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

শুধু কংগ্রেস বা কমিউনিস্টরাই নয়, পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল, তাদের সভা সমিতি, ১৫ আগস্ট, ২৬ জানুয়ারি মঞ্চে আপনারা কোনোদিন দেখেছেন কাউকে দাঁড়িয়ে পূর্ণ জাতীয় সংগীত বন্দেমাতরম্ গাইতে? যে গান গেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যদুনাথ ভট্টাচার্য, দক্ষিণারঞ্জন সেন, সরলা দেবীচৌধুরাণীরা বাঙ্গালির মনে দেশপ্রেমের বন্যা এনে দিয়েছিলেন, সেই অখণ্ড বন্দেমাতরম সংগীত কি এরা গেয়েছে কোনোদিন? না, গায়নি। গাইবেও না। কারণ সেই ১৯২৩ সালের মানসিকতা। ভোটব্যাংকের রাজনীতি। বন্দেমাতরমকে তারা সাম্প্রদায়িক মনে করে। বন্দেমাতরম্ গাইতে তাদের লজ্জা করে।

এর মাঝে একমাত্র ব্যতিক্রম এ দেশের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং তার দ্বারা অনুপ্রাণিত সংগঠনগুলি। জনসঙ্ঘের আমল থেকে আজকের বিজেপি, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, বিদ্যাভারতী, মজদুর সঙ্ঘ, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম প্রভৃতি প্রায় ৪০টি সংগঠন আজও তাদের সমস্ত কার্যক্রমের সূচনা করেন অখণ্ড বন্দেমাতরম্ সংগীতের মাধ্যমে। এটাইতো প্রকৃত অর্থে দেশপ্রেম। এটাতো জাতির অস্মিতার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

আজ বাঙ্গালির প্রায়শ্চিত্ত করার দিন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মহামন্ত্র, বাঙ্গালির সৃষ্টি জাতীয় সংগীত বন্দেমাতরমের শতবর্ষে আমরা তার হৃত সম্মান ফিরিয়ে আনতে পারিনি। কিন্তু তার ১৫০ তম বর্ষে আমাদের সেই পাপ ধুয়ে নিতে হবে। পূর্ণ বন্দেমাতরমের স্বরূপ অনুধাবন করতে হবে। দেশ আমাদের কাছে কেবল একখণ্ড ভূমি নয়, মাটির প্রতিমা নয়, এক চৈতন্যময় জীবন্ত সত্তা। যুগে যুগে এই দেশকে প্রণাম জানিয়েছেন সন্ত মহাত্মারা। শ্রীরামচন্দ্র বলেছেন 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী', শ্রীকৃষ্ণ একে বর্ণনা করেছেন 'ধর্মক্ষেত্র' রূপে, ঋষি অরবিন্দ বলেছেন, 'দেশ হলো মাতৃস্বরূপা, মৃন্ময়ী আধারে চিন্ময়ী সত্তা। স্বামীজী তাঁর স্বদেশমন্ত্রে এই দেশকে 'বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র' বলে বন্দনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশকে 'অয়ি ভুবনমনমোহিনী মা' বলে সম্বোধন করে তার মধ্যে দেবী চণ্ডীর রূপ প্রত্যক্ষ করে লিখেছেন 'ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ, দুই নয়নে স্নেহের হাসি, লালটনেত্র আগুনবরণ'। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন, 'বন্দিল সবে, 'জয় মা জননী! জগত্তারিণী জগদ্ধাত্রী! ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ! গাইল, 'জয় মা জগন্মোহিনী! জগজ্জননী! ভারতবর্ষ।' সুভাষচন্দ্র বসু এই দেশকে দেবতার লীলাভূমি বলে বর্ণনা করে মা প্রভাবতী দেবীকে চিঠিতে লিখেছেন, 'ভারতবর্ষ ভগবানের বড়ো আদরের স্থান'। এই দেশকে উদ্দেশ্য করে কবি নজরুল লিখেছিলেন, 'জননী মোর জন্মভূমি, তোমার পায়ে নোয়াই মাথা। স্বর্গাদপি গরীয়সী, স্বদেশ আমার ভারতমাতা।... আদি জগদ্ধাত্রী তুমি জগতের প্রথম প্রাতে, শিক্ষা দিলে দীক্ষা দিলে করলে মানুষ আপন হাতে।' এত মহাপুরুষের সম্মিলিত প্রণতি ও বন্দনাই তো হলো বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সংগীত। আমরা ভারত সন্তানরা যদি আবার দেশমাতৃকাকে তার রত্নসিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাই তবে সবার আগে চাই তাঁর স্তবমন্ত্র বন্দেমাতরমের পুনর্জাগরণ। স্বমহিমায় তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। বন্দেমাতরমের সার্ধশতবর্ষে ভারতমায়ের শ্রীচরণে এটাই হোক আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য। □

ফঃ ৩

তৃণমূলি বেশে কমিউনিস্টরা

অজয় ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গে বাম শাসন এখনো শেষ হয়নি। বকলমে তা রয়ে গেছে। বামেদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শাসন করছে তৃণমূল। তৃণমূলকে ভরিয়ে তুলেছে বাম। তৃণমূলকে পুষ্টি জোগাচ্ছে বাম। বামেরাই তৃণমূল-বিজেপি সেটিং তত্ত্ব বাজারে চাউর করেছে। ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত একটানা ৩৪ বছর ক্ষমতায় ছিল বামফ্রন্ট। কিন্তু ২০০৬ সালের পর বাম নেতারা বুঝতে পারেন বাম শাসনের প্রতি মানুষের অসন্তোষ যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে তাদের পক্ষে আর ক্ষমতা ধরে রাখা সম্ভব নয়। উন্নততর বামফ্রন্টের স্লোগানও ফিকে হয়ে গেছিল বস্তাপচা থিয়োরির কচকচানিতে। নেতৃত্বের শীর্ষস্তরে প্রবীণ নেতাদের এতটাই দাপট ছিল যে নবীন প্রজন্মের নেতারা নিজেদের মতামত প্রকাশ করার সুযোগই পেতেন না। প্রবীণ নেতারা যে সুযোগ সুবিধা পেতেন, নবীন প্রজন্মের নেতারা তা পেতেন না।

তাছাড়া নানা কারণে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রতিও অনেক বাম নেতা আর আস্থা রাখতে পারছিলেন না। নেতৃত্ব পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতেন তাঁরা। কিন্তু বামফ্রন্টে থেকে সেটা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই তাঁরা ছদ্মবেশ ধারণ করলেন। ঢুকে পড়লেন একটা খোলসে। সেই খোলসটি হলো তৃণমূল কংগ্রেস— যা কংগ্রেসিদের একাংশ, বাম এবং অতিবামেদের একাংশ নিয়ে মিলিজুলি একটা দল। বাকিরা থেকে গেলেন পুরোনো দলে। পুরোনো দলে থেকে তৃণমূলের পরিপূরক হয়ে কাজ করতে শুরু করলেন। তাই তাঁরা ভোটের সময় আওয়াজ তোলেন 'নো ভোট টু বিজেপি'। বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা বলেন, 'রাজ্যের স্বার্থে তৃণমূলকেই চাই'। সবটাই নেত্রীর সঙ্গে বোঝাপড়া আর সমঝোতার বিনিময়ে। তাই নাগরাকাটায় ত্রাণ দিতে গিয়ে আক্রান্ত হন বিজেপির এমএলএ, এমপিরা। অথচ সেই সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত চার জেলায় নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে ভাগাভাগি করে পৌঁছে যায় সিপিএম এবং এসএফআই নেতৃত্ব। ত্রাণ দিতে গিয়ে তাঁদের আক্রান্ত হওয়ার ভয় থাকে না। আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার মা-বাবা বাম ও অতিবামদের উপর আস্থা রেখে কিছুই পাননি। আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে তারা ঘেঁটে দিয়েছিল আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। নির্যাতিতার ন্যায়বিচারের দাবি অপেক্ষা ডাক্তারদের সুযোগ সুবিধা আদায়ের দাবি মুখ্য হয়ে উঠেছিল। উলটে তাঁরা শাসক দলকে সুবিধা করে দিয়েছিলেন। সময় নষ্ট করে নির্যাতিতার বিচারের দাবি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর করে ছেড়েছিলেন। তাহলে সেটিং কার সঙ্গে কার?

২০০৬ সালের শেষের দিকে শুরু হয়েছিল সিঙ্গুর আন্দোলন। সিঙ্গুর আন্দোলনে বাম নেতাদের একটা অংশ গোপনে এবং অতিবামরা প্রকাশ্যে সমর্থন করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরাও সরকারের ভূমি অধিগ্রহণ নীতির সমালোচনায় সরব হয়েছিলেন এবং সিঙ্গুর আন্দোলনের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি ও সমর্থন প্রকাশ করেছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সরকার তৈরি হওয়ার পর তাঁদের আর সংগোপনে থাকার প্রয়োজন হয়নি। উঠে এসেছিলেন নতুন মঞ্চে। যেন নতুন বোতলে পুরোনো মদ। আব্দুল রেজ্জাক মোল্লা থেকে শুরু করে উদয়ন গুহ মায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বুথ লেভেল থেকে শুরু করে রাজ্যস্তরে অসংখ্য বাম নেতা তৃণমূল নামক দলে ঢুকে লুটেপুটে খাওয়ার রাস্তা বেছে নিলেন। বুদ্ধিজীবীদের জন্যেও মাসোহারার ব্যবস্থা হলো। রাজনীতি বনে গেল একটি পেশা। করেকম্মে খাওয়ার জায়গা। ইনভেস্টমেন্ট শূন্য, কিন্তু প্রচুর রিটার্ন। নেত্রী প্রকাশ্য প্রশাসনিক সভায় নেতাদের পরামর্শ দেন 'একা খাবেন না, সবার সঙ্গে ভাগ করে খান'। বাম নেতারা দেখলেন এই হলো মহা সুযোগ। লাইন দিয়ে ঢুকে পড়লেন ঈপ্সিত দলে। আদি তৃণমূলিদের আর দেখা যায় না। বামেরাই এখন বড়ো তৃণমূল। ভরত যেমন সিংহাসনে শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা রেখে রাজ্য শাসন করেছিলেন তেমনি বামেরা মমতাকে সামনে রেখে নিজেদের অভিষ্ট পূরণ করে চলেছেন। কারণ সরাসরি বামেদের কেউ ভোট দেয় না। তাই ক্ষমতার অলিন্দে থাকতে তাঁদের এই ছদ্মবেশ— তৃণমূলি বেশ।

সংসার সুষ্ঠুভাবে চালানোর দায়িত্ব মায়েদের

মৌ চৌধুরী

সাধারণত সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া পোস্টগুলি ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যাই। কিন্তু খুব সম্প্রতি একটি পোস্ট মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম। বিষয়টি পুরনো প্রায় সকলেরই জানা, অনেকের হয়তো অভিজ্ঞতাও আছে। বিষয়টি হলো, একজন গৃহবধূ তাঁর অসুস্থ ও বয়স্ক শাশুড়িকে নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গিয়ে বিভ্রাটে পড়েছিলেন সেই চিরন্তন 'গল্প'। মধুমেহ রোগে আক্রান্ত সেই গৃহবধূর শাশুড়ির পায়ে একটি ফুসকুড়ি হয়েছিল। সেই থেকে তিনি এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে কলকাতার একটি বড়ো বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। ভর্তির পর শুরু হয় হাজারো পরীক্ষা এবং তথাকথিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের আনাগোনা। সমস্ত রিপোর্ট স্বাভাবিক। চারদিনে মোট তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা খরচ হয়েছে কিন্তু ফুসকুড়ির কোনো চিকিৎসাই হয়নি। এমনকী সামান্য ড্রেসিং পর্যন্ত করেনি। চিকিৎসকদের বিশ্বাস করে এত টাকা খরচের পর প্রতারিত হয়ে এই পরিবারের মন খারাপ। চিকিৎসক ব্যবসায়ীদের এই প্রতারণার কোনো সুবিচার সম্ভবত এখনো পর্যন্ত কোনো পরিবার পায়নি।

অসুস্থ হলে স্বাভাবিকভাবেই সবাই চিকিৎসকের কাছে ছুটতে বাধ্য হন। আবার গুরুতর অসুস্থ হলে নার্সিংহোম ছাড়া গতি নেই। কেউ হাসপাতালে ভর্তি হলে তাঁর গোটা পরিবারের মানসিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই সুযোগটাই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ ও চিকিৎসকরা নেয়। গুরুতর অসুস্থ হলে বা হৃদরোগ, সুগার, প্রেসার, ইউরিক অ্যাসিড বা এই ধরনের ক্রনিক অসুখ থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতেই হয়। কিন্তু আবার সেই পুরনো কথাতেই ফিরে আসতে হয়, আমাদের ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্র, ঋষিদের দেখানো পথ ধরে প্রাণায়াম করা, সঠিক নিয়ম মেনে খাদ্যাভ্যাস করলে অনেক অসুখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এমনকী যাদের ক্রনিক রোগ আছে তারাও এইসব নিয়ম মেনে চললে অনেকটাই ভালো থাকবেন।

পদ্মশ্রী প্রাপ্ত কেরলের কাল্লেলিভাগমের প্রখ্যাত আর্যুবেদ চিকিৎসক ভিএস মরুগম্মান বলেন, ভালো থাকার জন্য রোগীকেই সচেতন হতে হবে। শরীর চর্চা ও খাবারের পরিমিতি বোধ সম্পর্কে নিজেকে বুঝতে হবে। এই কথাগুলি অবশ্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এর পাশাপাশি বাড়ির গৃহিণীকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। অনেকেই বলেন এত ব্যস্ততার ভেতর একা গৃহিণীর পক্ষে সবদিক সামলানো সম্ভব নয়। কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার নয়, কিন্তু মনে রাখতে হবে ঐতিহাসিক ভাবে সত্য ভারতে ইসলামি শাসনের আগে ব্যাপকভাবে এবং পরে নিরাপত্তার স্বার্থে বিক্ষিপ্ত ভাবে ঘরে-বাইরে কাজ করেছেন মহিলারা। ফলে মহিলারা চিরকাল রান্না করা ও সন্তানের জন্ম দেওয়া ছাড়া কোনো কাজ করেননি এই কথা সম্পূর্ণ ভুল।

সংসার সুষ্ঠভাবে চালানোর দায়িত্ব মায়েদের। তাই রোজকার খাবারের ক্ষেত্রে পরিবারের সকলের প্রয়োজনীয় ও সুষম খাদ্যের প্রস্তুতি নিতে হয় তাঁদেরই। বাইরের খাবারের পরিবর্তে ঘরে তৈরি খাবারের উপকারিতা অনেক বেশি; পাশাপাশি অর্থেরও সাশ্রয় হয়। বাইরের মুখরোচক ও মশালাদার খাবার খাওয়া, অপ্রয়োজনীয় কারণে রাত জাগা, সঠিক নিয়ম না মেনে জিম করা কোনোটাই ঠিক নয়।

নতুন করে বলার কিছু নেই যে, এই কারণেই অল্প বয়সিদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা যাচ্ছে। এর ভেতর অ্যাসিডিটি, গ্যাস, ফ্যাটি লিভার, বদ হজম, কিডনির সমস্যা, সুগার, হৃদরোগ এখন প্রায় সব ঘরের গল্প।

কিছুদিন আগেও পর্যন্ত বাড়ির বয়স্ক সদস্যরা আলাদা গুরুত্ব পেতেন। ব্যতিক্রম থাকলেও বয়স্করা এখন প্রায় বোঝা। রাতে একটা নির্দিষ্ট সময়ে সবাই মিলে এক টেবিলে বসে খাওয়ার নিয়ম আর নেই বললেই চলে।

এই সবের ভেতরেও নিজেকে ও পরিবারকে ভালো রাখতেই হবে বলে মনে করেন সমাজ বিজ্ঞানীরা। এই ভালো রাখা শুরু হতে পারে খাদ্যাভ্যাস দিয়ে। কারণ শরীর সুস্থ থাকলে জীবনে অনেকটাই শান্তি থাকে। ডায়াটেশিয়ান সংযুক্তা চক্রবর্তী জানান, সমস্ত ধরনের খাবারের ভেতর কিছু না কিছু খাদ্যগুণ থাকে, তবে কোন খাদ্যগুণ প্রয়োজনীয় সেটা নির্ভর করে শরীরের গঠনের ওপর। যে কোনো ভোজ্য তেল, মাখন, চিনি, লবণ, পনির, বোতলের ঠাণ্ডা পানীয়, ময়দা থেকে তৈরি খাবার, চিজ, শুকনো লঙ্কা, বিস্কুট, অবশ্যই ফাস্ট ফুড খাবারের তালিকা থেকে একেবারেই কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে। পরিবর্তে গুড়, ঘি, শাক, বিভিন্ন ধরনের তরকারি, কাঁচা হলুদ, মেথি, শশা, লেবু-সহ অগুনতি খাবার আছে। সংযুক্তা চক্রবর্তী মনে করেন খাদ্য তালিকায় 'না'-এর থেকে 'হ্যাঁ' অনেক অনেক বেশি। কিন্তু শরীর কোনটা নেবে সেটা নিজেকে বুঝতে হবে। কবে অসুস্থ হবে বা কখন বয়েস বাড়লে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করা হবে সেটা না করে এখনই এখন থেকেই সচেতন হওয়া প্রয়োজন। □

চোখের ব্যথার কারণ ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

আমাদের সকলেরই কোনো সময়ে চোখের ব্যথার সমস্যা হয়। তবে শুধু চোখ নয়, তার আশেপাশেও ব্যথা হয়। কখনো চোখের সমস্যা কখনো আবার মস্তিষ্কের সমস্যার জন্য চোখে ব্যথার উপসর্গ থাকতে পারে। অনেক সময়ে আবার মাথার রেফার্ড পেইনও চোখে চলে আসে। সেক্ষেত্রে কোনটা মাথা থেকে আসছে, আর কোনটা শুধুই চোখের ব্যথা তা বুঝতে হবে রোগীকেই। চোখ ব্যথার কারণ চোখের রোগ ছাড়াও বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতাও হতে পারে। বেশ কয়েকটি কারণে চোখে ব্যথা হয়, এগুলির মধ্যে অনেকগুলিই কোনো ভয়ংকর রোগের উপসর্গ। তাই চোখের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে ব্যথা হলে কখনো ফেলে রাখবেন না, যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসককে দেখান।

১. পাওয়ার বাড়লে চোখে ব্যথা করে। এই ব্যথার একটা টিপিক্যাল ধরন রয়েছে। চোখ থেকে শুরু করে একদিকে ব্যথাটা মাথার পিছনে যায়। তারপর কপালের দু'দিকেই ছড়িয়ে পড়ে। গা বমি ভাব থাকে। অনেকে এটাকে মাইগ্রেনের ব্যথার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন। তবে যদি দেখেন যে মাইগ্রেনের ওষুধ খেয়েও ব্যথা কমছে না তাহলে অবশ্যই চোখ পরীক্ষা করাবেন। হতে পারে পাওয়ার হয়েছে কিংবা পাওয়ারের রদবদল হয়েছে। এক্ষেত্রে চশমা বদলাতে হবে।

২. চোখে ব্যথার আরও একটি কমন কারণ হলো কনজাঙ্কটিভাইটিস, যাতে বাংলা ভাষায় বলে চোখ ওঠা। এই সংক্রমণে চোখে ব্যথা হয়ে ফুলে যায়, চোখ লালচে হয় এবং চোখে ক্রমাগত জ্বালাপোড়ার অনুভূতি হতে থাকে। সাধারণত অ্যালার্জি থেকেই চোখের আবরণীর এই ইনফ্লামেশন হয়। তবে ভাইরাস বা ব্যাক্টিরিয়ার আক্রমণেরও কনজাঙ্কটিভাইটিস হতে পারে।

৩. চোখের পাতায় কোনো কারণে প্রদাহ হলেও সেখান থেকে চোখে ব্যথা হয়।

৪. চোখের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কর্নিয়া। এই কর্নিয়া খুব সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল। এতে কোনো কারণে আঘাত লাগলে বা আচমকা কোনো কিছু ঢুকে গেলে চোখে প্রথমে চুলকানি ও অস্বস্তি হয়, সঙ্গে তীব্র ব্যথাও হয়।

৫. কর্নিয়ার ইমফ্লেমেশন চোখে ব্যথার সহজ কারণগুলির মধ্যে অন্যতম। বিশেষ করে যাঁরা কনট্যাক্ট লেন্স বেশি ব্যবহার করেন, তাদের এই সমস্যায় ভোগার ঝুঁকি বেশি থাকে।

৬. অনেক সময় সমুদ্রের ধারে বসলে বালুকণা, বাদামের খোসা চোখে ঢুকে পড়ে। কিংবা ছোটো সূক্ষ্ম কণা বা রাসায়নিক ঢুকলেও যত কম বা ছোটই হোক না কেন চোখে প্রবল অস্বস্তি-সহ ব্যথা হয়। অবশ্য চোখে খুব ভালো জলের ঝাপটা দিলে এগুলি বেরোলেই ব্যথা কমে। তবে যাঁদের চোখে হাই-ইন্ট্রাঅক্যুলার প্রেশার বা অক্যুলার হাইপারটেনশন আছে, তাঁরা জলের ঝাপটা দেবেন না।

৭. চোখের প্রেশার বাড়লে চোখে ব্যথা হয়, তবে এই ব্যথা অন্যসব ব্যথার থেকে একেবারে পৃথক অনুভূতি দেয়।

৮. গ্লুকোমাও চোখে ব্যথার অন্যতম কারণ। অনিয়ন্ত্রিত চোখের প্রেশার অনেক সময়েই গ্লুকোমার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষ করে যাঁদের পারিবারিক ইতিহাস রয়েছে। এর লক্ষণ তীব্র মাথাব্যথা, বমি বা গা গুলানো, দৃষ্টিশক্তি অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া। সঠিক সময়ে চিকিৎসা না করলে এই রোগ থেকে অন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৯. চোখের নার্ভের কারণে অনেকসময় ব্যথা হয়, যেটা সচরাচর সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। স্ক্লেরোসিস বা ইনফ্লামেশন হলেই এই সমস্যা হয়। এতে দৃষ্টিশক্তি কমে আসার ঝুঁকি থাকে।

১০. চোখের পাশেই সাইনাসের অবস্থানের জন্য সাইনুসাইটিস হলে চোখে রেফার্ড পেইন হয়। চোখে ব্যথার সঙ্গে যদি অস্পষ্ট দেখা, চোখ দিয়ে ক্রমাগত জল পড়া, চোখের ভিতর কিছু আটকে আছে এরকম অনুভূতি হওয়া, মাথা ঘোরা, গা গুলানো, চোখের মণি লালচে বা গোলাপি হয়ে যাওয়ার মতো লক্ষণগুলো থাকে তাহলে চিকিৎসকদের কাছে যেতে হবে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা :

মায়াজম, কারণ ও লক্ষণ মিলিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করলে উপকার পাওয়া যায়। আমরা যে সমস্ত ওষুধগুলি ব্যবহার করে সুফল পেয়েছি সেগুলি হলো বেলেডোনা, স্ক্রুনাস স্মাইনোমা, উফানিয়া বারবেটা, ম্যাগফস, ল্যাকক্যানাইনাস, ল্যাকেসিস, পালসেটিলা, ওনাম সোডিয়াম প্রভৃতি।

তবে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। কারণ চিকিৎসক রোগের লক্ষণ মিলিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ওষুধটির শক্তি নির্বাচন করে থাকেন যা চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। □

বেড়েছে। আগে রিকশা ভ্যান। এখন হাতি। বাইরে এখন বেশ বড়ো আর সাজানো-গোছানো 'গেট' তৈরি হয়। উপর থেকে নীচে পর্যন্ত আলোর সারি ঝোলে। সারা বাড়ি আলোয় আলো। ধীর লয়ে ভক্তিগীতি বাজছে। আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি লোকের আসা-যাওয়া। চেনা-অচেনা। প্রায় শ' তিনেকের মতো মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করেন। ভক্তদের আনাগোনা, শ্রদ্ধাভক্তিতে সেই রাত্রি স্বস্তিকা হয়ে উঠে ঠাকুর বাড়ি— মা-র মন্দির।

সেই ১৯৭৫ সাল। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে স্বস্তিকায় শুরু হয়েছিল মা কালীর আরাধনা। তখন সারা দেশে জরুরি অবস্থা চলছে। স্বস্তিকার উপর তখন শাসকের শ্যেন দৃষ্টি। স্বস্তিকার লেখালিখির কাজটা তখন সমালাতেন ভবেন্দু ভট্টাচার্য। 'ডি ফ্যাক্টো' সম্পাদক। স্বস্তিকাকে ঘিরে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল জরুরি অবস্থার কারণে তা অনেকটাই স্তিমিত। সেসময় স্বস্তিকার একতলায় একটা ঘরে ছিল বিদার্থী পরিষদের অফিস। মায়ের পূজার কদিন আগে বেলা দশটা-এগারোটা হবে, ভবেন্দুদা সেই ঘরে এলেন। তখন গোঁসাই দাস নামে এবিভিপি-র

স্বস্তিকায় শ্রীশ্রীকালীপূজার পঞ্চাশ বছর

বিজয় আঢ্য

গত পঞ্চাশ বছর ধরে 'সেই ট্রাডিশন' সমানে চলেছে। পূজার দিনে মা-কে যে ছেলেদের কত কসরত করে একতলা থেকে দোতলায় আনতে হয় মা তা ভালোই জানে। ছেলেরা করছে বলে মা মুখ বুজে সব সহ্য করে, এই যা! তপন কাহারের চীৎকার ও দাবড়ানি, চিত্ত পাত্রর মুখ ঝামটা, অন্যদের নানারকম পরামর্শ— প্রতি বছরে সেই একই দৃশ্য। আবার মা যখন ফিরবেন, তখন আরও বেশি। আরও লোক। এই এই, গেল গেল। না, উৎকণ্ঠা অবশ্য শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয় না। মা বেশ ভালোভাবেই এখন যান্ত্রিক হাতিতে গিয়ে বসেন। সঙ্গে পূজার সব জিনিসপত্র— ফুল, মালা, ঘট, খাঁড়া, চাঁদমালা, মায় শিয়ালটি পর্যন্ত। শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, জয় মা, আবার আসছে বছর— এমন সব ধ্বনি শুনতে শুনতে মা বিবেকানন্দ রোড পেরিয়ে ক্রমশ বিলীন হয়ে যান। ঘণ্টা দেড়েক পর মায়ের ছেলে-মেয়েরা ফেরে। শান্তিজল ছেটায়। মিষ্টিমুখ হয়। শুরু হয় প্রতীক্ষা। গত পঞ্চাশ বছর ধরে বলতে গেলে এই একই চালচিত্র। বাইরের জাঁকজমক যা একটু

কুমারী মাকে নিয়ে পূজামণ্ডপে।

একজন কার্যকর্তা সেখানে ছিলেন। ভবেন্দুদার এ সময়ে আসা ও চোখমুখের ভাব দেখে গোঁসাইদার মনে হলো তিনি যেন বিশেষ কিছু বলতে চান। ভবেন্দুদা বললেনও, দেখো গোঁসাই, স্বস্তিকায় এবার কালীপূজা করব। যেসব পুরনো খবরের কাগজপত্র আছে, সেসব বিক্রি করে কিছু অর্থের সংস্থান করা যাবে। তবে সবার আগে অমলদা (অমল কুমার বসু) ও কালিদাকে (কালিদাস বসু) রাজি করাতে হবে। নন্দলাল সাউকেও বলতে হবে। নন্দদা তখন কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট। সঙ্ঘের বিবেকানন্দ ভাগের ঘোষ প্রমুখ। খুবই উৎসাহী। শুনলে আশ্চর্য হবেন, পুরনো কাগজপত্র বিক্রি করে পূজার জন্য এখনও অর্থ জোগাড় করতে হয়। এরপর একটু থেমে গোঁসাইদাকে বললেন, তোমাকে কিন্তু পূজার দায়িত্বটা নিতে হবে। ভবেন্দুদার প্রস্তাবে গোঁসাইদা এককথায় রাজি। পূজার প্রস্তাব শুনে অভিরামদা, চিত্ত পাত্র

শান্তিজল বর্ষণ করছেন ভবেন্দু ভট্টাচার্য।

এককথায়— স্বস্তিকার সেই সময়ের কর্মীরা সবাই খুশি।

স্বস্তিকার সম্পাদক সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তো আছেনই। সবাই একসঙ্গে কোমর বেঁধে মায়ের পূজার আয়োজনে নেমে পড়লেন। নন্দদা রান্না মানে রাতের ভোগ-প্রসাদের দায়িত্ব নিলেন। ঠিক হলো, খিচুড়ি, তরকারি, চাটনি আর পায়েস হবে। রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটের বস্তুভাণ্ডারে তখন রান্নার বাসনপত্র ইত্যাদি থাকত। সেখান থেকেই কড়াই-গামলা-হাঁড়ি, বালতি সব আনা হলো। পূজার বাসনপত্র আসতো বিকাশদার (ভট্টাচার্য) বাড়ি থেকেও। সেই বাড়ি থেকে বউদি (আকাশদার স্ত্রী) আসতেন পূজার জোগাড় করতে। চিত্তদা সেসব বাসনপত্র গুণে গেঁথে নিয়ে ও দিয়ে আসতেন। সেসময় স্বস্তিকার তেতলায় কোনো ঘর ছিল না। ছিল শুধুই ছাদ। বাড়ির প্রথম দিকটা ভাড়ায় একটা পরিবার থাকত। অর্থাৎ এখনকার অর্ধেক জায়গা। স্থানীয় এক স্বয়ংসেবক শঙ্করজী গুপ্তার মাইক ও ডেকরেটার্সের দোকান ছিল। তার সাহায্য নিয়ে ছাদে ম্যারাপ বাধা, লাউড স্পিকারের ব্যবস্থা হতো। শঙ্করজী এখন নেই। কিছু দিন আগে গোঁসাইদাও চলে গেছেন।

স্থির হলো, পূজা স্বস্তিকার দোতলার ঘরে এখন যেটা কম্পিউটার রুম, সেখানে হবে। দর্শনার্থীদের বসবার ব্যবস্থা নীচে বিদ্যার্থী পরিষদের ঘরে হলো। সন্ধ্যা থেকেই অতিথিদের আসা শুরু হতো। প্রায় সবাই ফুল-মালা-মিষ্টি নিয়ে পূজা দিতে আসতেন। দিতেন দক্ষিণাও। আসলে মায়ের পূজার জন্য এক একজন একটা দায়িত্ব নিতেন। কেউ নিতেন প্রতিমার, কেউ পূজার সামগ্রী, কেউ ভোগের চাল, ডাল বা তেলের। কেউ-বা মাছ ইত্যাদি। ভক্তদের এই অনুদানেই স্বস্তিকার পূজা হতো। এখনও হয়। সবাই নিজের পূজা বলেই মনে করতেন। একবার একটা মজার ঘটনার কথা বলি। ধুনুচিতে দেওয়ার জন্য ভবেন্দুদা চিত্তদাকে 'গুল' আনতে বলেছিলেন। চিত্তদা 'ফুল' নিয়ে হাজির। চিত্তদার বয়স এখন সত্তরের কোটায়। লড়ে যাচ্ছেন। এখন যেমন নানা জায়গা থেকে পূজার সামগ্রী নিয়ে আসা হয় তখন সব সামনের শ্রীমানী বাজার থেকেই আসত। মূলত স্বস্তিকার কর্মীদেরই তখন সব করতে হতো। বিশেষ কোনো বাহুল্য ছিল না। স্বস্তিকার প্রবেশ দ্বারে কলাপাতা, মাটির কলসী আর সিঁদুর দেওয়া ডাবই থাকত। বিবেকানন্দের রোডের পেছনে একটা পিজি হোস্টেল (মেয়েদের জন্য) ছিল। সেখানে বিদ্যার্থী পরিষদের কয়েকজন ছাত্রী ছিলেন। তারাও পূজার জোগাড়ে আসতেন।

স্থির হলো, ভবেন্দুদা নিজেই পূজা করবেন। তাঁকে পূজায় ও মায়ের ভোগ রান্নায় বউদি ও এইসব মেয়েরাই সাহায্য করবেন। অসুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ভবেন্দুদা বরাবর সারাদিন উপবাস করে রাতভর মায়ের পূজা করতেন। এখানে প্রসঙ্গত কিছু কথা বলা দরকার। ভবেন্দুদার কথামতো প্রতিমার মাপ পাঁচ পোয়া হবে। রং হবে মহামেঘের রং। এলোকেশী। দক্ষিণাকালী মা-কে কাপড় পরিয়ে কুমোর বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে হবে। প্রতি বছর মায়ের কাপড় কেউ না কেউ দিতেন। এ নিয়ে এখন আবার একটা চাপা প্রতিযোগিতা হয়। মজা পাই।

স্বস্তিকায় মায়ের পূজার আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো কুমারীপূজা। পরিচিত কোনো বন্ধুর ছোটো মেয়েকে কুমারী রূপে পূজা করা হয়। স্বস্তিকার প্রকাশকের নামেই প্রধানত পূজা হয়ে থাকে। সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, রণেন বন্দ্যোপাধ্যায়, তিলকরঞ্জন বেরা, সারদাপ্রসাদ পাল (জয়ন্তদা)— এই কয়েকজনের নাম মনে পড়ছে। যতদূর মনে আছে, স্বস্তিকার কর্মী বিবেক চট্টোপাধ্যায়ের এক আত্মীয়ের ছোটো মেয়েকে কুমারী রূপে স্বস্তিকায় প্রথম পূজা করা হয়। সেই থেকেই প্রতিবছরই নিয়ম মেনে কুমারী পূজা হয়ে আসছে। ভারতবর্ষে নারীকে

মাতৃস্বরূপে দেখা হয়ে থাকে। স্বস্তিকা এই ভারতীয় পরম্পরাকেই অনুসরণ করে চলেছে।

রাত্রির চার প্রহরে মায়ের পূজা হয়ে থাকে। মাঝে একবার 'মহাকাল'-এর পূজা হয়। গভীর রাতের পূজাতে ভবেন্দুদা ভাবস্থ হয়ে পড়তেন। শুধুই মা মা ডাক... আর আশ্চর্যের কথা, মা বোধ হয় ভবেন্দুদার ডাক শুনেছিলেন। ১৯০৫-এর মায়ের বিসর্জনের পরের দিন প্রতিপদের ভোরেই ভবেন্দুদাও ভবতারিণীর সঙ্গে ভবসাগর পাড়ি দিলেন। শ্রীকান্ত (সেবক) ডাকতেই শেষ মুহূর্তে ভবেন্দুদার গলায় গঙ্গাজল দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল।

এবারের পূজা ভক্তমণ্ডলী।

যেসময় স্বস্তিকার পূজা শুরু হয়, তখন পশ্চিমবঙ্গে পরিষদের কাজ দেখতেন লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা। সেইসঙ্গে ছিলেন বিকাশ ভট্টাচার্য, রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোঁসাই দাস, শক্তি শেখর দাস-সহ অনেকেই। পূজার কাজে তারাও শামিল হতেন। কিন্তু সবার উপরে ছিলেন শ্যামচাঁদদা— শ্যামচাঁদ মল্লিক। সঙ্গে স্বস্তিকার ম্যানেজার অনিল কুণ্ডু। মূলত অভিরামদা কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা নিয়ে আসতেন। প্রতিমা নিয়ে আসা হতো পূজার আগের দিন, যা এখনও হয়। ভবেন্দুদার মৃত্যুর পর যারা মায়ের পূজা করে এসেছেন যথাক্রমে নবকুমার ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী, বাঁকুড়া থেকে আসা একজন পুরোহিত মহাশয় এবং ইদানীং রতন চক্রবর্তী ও তাঁর সহযোগী অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়।

এই পূজা যেন এক মিলন মেলা। স্বস্তিকার সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত প্রায় সবাই আসেন এবং এখনও আসেন। স্বস্তিকার বিশিষ্ট লেখকরা, গ্রাহক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ী, আশেপাশের পাড়াপড়শি। গত বছরের মতো এবারও (১৯২৫) কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এসেছিলেন। সঙ্ঘের বরিষ্ঠ কার্যকর্তারা, স্থানীয় স্বয়ংসেবকরা তো আসেনই। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সনৎদা, কালিদা, রণেনদা, তিলকদা, জয়ন্তদা, দুর্গাদা (ঘোষ) প্রমুখ তো পরিবার-সহই আসতেন। ড. দীনেশ সিংহ, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, রণজিৎ রায় (গূঢ়পুরুষ), নিশাকর সোম, এষা দে, রমানাথ রায়, কণাবসু মিশ্র, সুমিত্রা ঘোষ, পবিত্র ঘোষ, গোপাল রায়, প্রফেসার কুণাল চক্রবর্তী, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বহু বিশিষ্ট লেখকরা নিয়মিত আসতেন। এখন এঁদের মধ্যে অনেকেই নেই। তবে বর্তমান প্রায় সব লেখকই কম-বেশি আসেন। স্বস্তিকার বর্তমান পরিচালক সমিতির সদস্যরা— সারদা প্রসাদ পাল, তিলকরঞ্জন বেরা, অরিন্দম সিংহ রায়, সৌরভ ঘোষ, অজিত জানা, দেবাশিস লাহিড়ী, অজয় গোয়েল, আনন্দমোহন দাস প্রমুখ। এছাড়া সুনীল গোস্বামী, অদ্বৈত দত্ত, রমাপদ পাল, জলধর মাহাত, প্রশান্ত ভট্ট, ড. জয়ন্তরায় চৌধুরী প্রমুখ সঙ্ঘের অনেক অধিকারী ও কার্যকর্তারাও উপস্থিত থাকেন। তথাগত রায়, স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ, দেবশ্রী চৌধুরী, প্রয়াত সুকুমার ব্যানার্জী, তপন সিকদার, সজল ব্যানার্জী, কর্ণেল কুণাল ভট্টাচার্য, পদ্মশ্রী নারায়ণ চক্রবর্তী, কর্ণেল সব্যসাচী বাগচী, মে:জে: কে কে গাঙ্গুলী, ড. শিবরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, অজিত বিশ্বাস, ড. অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. বিনয়ভূষণ দাশ, অসীম মিত্র ও তাঁর পরিবার। আর স্বদেশে থাকলে যিনি আসতেনই, তিনি স্বস্তিকার অভিভাবকতুল্য আমেরিকা প্রবাসী প্রযুক্তিবিদ নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য প্রমুখ আসতেন। এছাড়া এখন নাম মনে পড়ছে না এমন সব বহু প্রতিষ্ঠিত মানুষজন। সত্যি, সব মিলিয়ে এক মিলন মেলা।

এবার আসি ঘরের কথায়। গত কয়েক বছর ধরে স্বস্তিকার পূজার হাল ধরেছেন জয়রামদা আর সুকেশদা। দুজনেই মণ্ডল। স্বস্তিকার নতুন পূজামণ্ডলী এরা গড়ে তুলেছেন। স্বস্তিকার কর্মীরা— যারা ছিলেন বা এখনোও আছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন অজিত ভকত, সুবল দত্ত, প্রদীপ সাঁন্তারা, মণ্টু দাস, সঞ্জয় মুখার্জী, সম্রাট শীল, শুভময় দেব, শিশির গাতাইত, শ্রীকান্ত রানা, শিবু ঘোষ, সম্রাট পাল, পিনাকপাণি ঘোষ, অভিজিৎ রায়চৌধুরী, অভিজিৎ চক্রবর্তী, কমল পাত্র, হিমাংশু মাইতি-সহ স্থানীয় বীরেশ্বর শাখার বালক-কিশোর বাহিনী। অর্ণব নাগ ও সন্দীপ চক্রবর্তীর কথা মনে পড়ছে। স্বস্তিকার প্রাক্তন সম্পাদকের মূল দায়িত্ব ছিল অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানো। এখনও বকলমে সেটাই হচ্ছে।

এবারের ৫০-এর পূজা আরও উজ্জ্বল। পূর্বেকার সব রেকর্ড ছাড়িয়ে সাড়ে চারশোর বেশি সন্তান মায়ের পূজার প্রাঙ্গণ স্বস্তিকায় এসে হাজির হয়েছিলেন। অনেক অসুবিধা, অনেক ত্রুটি, কিন্তু কারও কোনো অভিযোগ নেই। সবাই মহানন্দে ছিলেন। এবারে মায়ের যাবার আগে মেয়েদের ফটো-সেসন। ছেলেরাও বাদ গেল না। হর্ষ ধ্বনি তো ছিলই। ঢাক ঢোলও। অন্যবারের তুলনায় এবারে মায়ের ফিরে যাওয়ার পথে সঙ্গী অনেক। হাতি-তে কেউ নেই। সবাই গাড়ির আগে চলেছে। এবার মা-কে নিয়ে যাওয়া হলো অন্য পথে। তারক প্রামাণিক রোড দিয়ে। অনেক স্বয়ংসেবকের বাড়ি সেই পাড়ায়। একটু দক্ষিণে গিয়ে ডানদিকে মোড় ঘুরতেই মা আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেল। সন্ধে সাতটার সময় সবাই ফিরল। শান্তিজল মাথায় নিয়ে 'আসছে বছর আবার হবে' বলতে বলতে সবাই ফিরে এল। ৫০-এর পূর্তি, এবার ৫১-র প্রস্তুতি। জয় মা! □

বালুরঘাটে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের বিজয়া সম্মিলনী

গত ২৬ অক্টোবর অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের 'বিজয়া সম্মিলনী' উৎসব অনুষ্ঠিত হলো বালুরঘাট নাট্যমন্দির প্রেক্ষাগৃহে। এই মিলনোৎসবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যকর্তা, পূর্বতন কার্যকর্তা এবং সংগঠনের শুভাকাঙ্ক্ষী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ-সহ প্রায় ৫০০ জন। সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়ে সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিগত দিনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন, সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পর্কিত আলোচনা ছাড়াও এদিনের কার্যক্রমের মাধ্যমে দেওয়া হয় ছাত্রশক্তির আগামীদিনের লড়াইয়ের বার্তা। গোটা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগঠনের কার্যকর্তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন আশি বা নব্বইয়ের দশকের দীর্ঘ সময়ে যাঁরা আদর্শের ভিত্তিতে, প্রবল প্রতাপশালী বামপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এই জেলায় সংগঠনের প্রদীপকে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন— সেই পূর্বতন কার্যকর্তারা। ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের পর সাধারণ মানুষের সঙ্গে মোহভঙ্গ ঘটে ছাত্র-যুবসমাজের একটি বড়ো অংশের। সেই সময় শাসকদলের সন্ত্রাস, হুমকি, চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে বিদ্যার্থী পরিষদের আদর্শকে আঁকড়ে ধরে যাঁরা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সংগঠনের কাজকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সেই কার্যকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানে বক্তাদের আলোচনায় উঠে আসে নানা প্রসঙ্গ। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি বঞ্চনার শিকার রাজ্যের যুবসমাজ। রাজ্যে কোনো কর্মসংস্থান নেই। শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের নিজের এবং পরিবারের অন্নসংস্থানের জন্য পাড়ি দিতে হচ্ছে ভিন রাজ্যে। যে বঙ্গভূমিকে এক সময় 'সোনার বাঙ্গলা' বলা হতো, সেই পশ্চিমবঙ্গ আজ শ্মশানে পরিণত হয়েছে বর্তমান তৃণমূল সরকার এবং তার পূর্বসূরী বামফ্রন্ট সরকারের দৌলতে। মাতৃসাধনার পীঠস্থান বঙ্গ, যেখানে ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায় দুর্গাপূজা, কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে মাতৃশক্তির ওপর নেমে আসা ঘৃণ্য আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানানো হয়। দেবী দুর্গার বিসর্জনে বাধা, স্কুলগুলিতে সরস্বতী পূজা করতে বাধা, শ্রীরামনবমী উদ্‌যাপনে বাধাদান, কালীমূর্তির মস্তকচ্ছেদন, মুণ্ডহীন মা কালীকে প্রিজন ভ্যানে তোলা, জেহাদিদের বাড়বাড়ন্ত, অনুপ্রবেশকারীদের নির্লজ্জ তোষণ, এসআইআর-এর কাজে বাধাদান-সহ রাজ্য জুড়ে যে ধরনের অরাজকতা চলছে, তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের ডাক দেওয়া হয় অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে।

কাশ্মীর থেকে শুরু করে অসম, গুজরাট থেকে মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহারে বিদ্যার্থী পরিষদের উল্লেখযোগ্য আন্দোলন এবং সংগঠনের সাফল্যের কথা তুলে ধরা হয়। সেই সঙ্গে দুর্বার আন্দোলনের মধ্য দিয়েই পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্ভব বলে বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে বার্তা উঠে আসে। এদিনের কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত বৌদ্ধিক প্রমুখ সুমন দত্ত, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্য সহ- সভাপতি কিশোর বসাক, জাতীয় কর্মসমিতির পূর্বতন সদস্য অতনু দাস, পূর্বতন জেলা প্রমুখ প্রবীর কুমার মণ্ডল, বর্তমান জেলা প্রমুখ জীবন মণ্ডল, জেলা সংযোজক অশোক বর্মণ-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট কার্যকর্তারা।

দীঘায় লোকপ্রজ্ঞার কার্যকর্তা কর্মশালা

গত ২৫ ও ২৬ অক্টোবর দীঘা সায়েন্স সেন্টার ও ন্যাশনাল সায়েন্স ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হলো অখিল ভারতীয় প্রবুদ্ধমঞ্চ প্রজ্ঞাপ্রবাহের পশ্চিমবঙ্গ শাখা 'লোকপ্রজ্ঞা'র কার্যকর্তা কর্মশালা এবং একটি সেমিনার। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের সহযোগিতায় আয়োজিত এই সেমিনারের মূল বিষয় ছিল— 'ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা (ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম)'। গত ২৫ অক্টোবর সকালে কর্মশালার উদ্বোধন হয় সকাল ১১টায়। পরদিন অর্থাৎ ২৬ অক্টোবর সকালবেলায় দীঘা ও ওড়িশায় চন্দনেশ্বরের বিভিন্ন মন্দির দর্শনের পর দুপুর ২টায় শুরু হয় মূল সেমিনার পর্ব।

সেমিনারে মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাঁথি প্রভাত কুমার কলেজের অধ্যক্ষ ড. অমিত দে, একই কলেজের অধ্যাপক অরিন্দম রায়, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. অনিল কুমার ঘোষ এবং হলদিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির অধ্যাপক ড. গৌতম বসু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন লোকপ্রজ্ঞার কার্যকর্তারা এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের পক্ষ থেকে অভিজিৎ বিশ্বাস।

প্রায় ১০০ জন অংশগ্রহণকারী এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। এই দু'দিনের কর্মসূচির মাধ্যমে ভারতীয় ঐতিহ্য, দর্শন ও জ্ঞানের ধারাকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয় লোকপ্রজ্ঞা ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজ।

বিজয়া ও দীপাবলী উপলক্ষ্যে মলঙ্গা লেনে জাতীয়তাবাদীদের মিলনোৎসব

গত ২৬ অক্টোবর মধ্য কলকাতাস্থিত বরেণ্য বিপ্লবীদের স্মৃতিবিজড়িত মলঙ্গা লেনে, জাতীয় আর্তত্রাণ সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন রাষ্ট্রবাদী সংগঠনের মিলনোৎসব ও ঘরোয়া বৈঠক। বিজয়া ও দীপাবলী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই প্রীতি সম্মেলনে জাতীয় অতিত্রাণ সমিতির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শান্তনু মুখোপাধ্যায়, নীহারিকা মুখোপাধ্যায়, মিতা মুখোপাধ্যায়, দেবাঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও অর্ক সরকার। জয়শ্রী পত্রিকা ট্রাস্টের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন— ডাঃ শঙ্কর কুমার চট্টোপাধ্যায়, রজত চক্রবর্তী ও চিত্তরঞ্জন দাশ। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন— মৈনাক চক্রবর্তী, স্বর্ণাভ মুখোপাধ্যায়। সৌম্যদীপ সরকার প্রমুখ। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সোমনাথ বসু ও সৌমিত্র দত্ত। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় সংহতির পক্ষ থেকে সমীর গুহ রায় এবং জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকার পক্ষ থেকে অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় এদিনের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে উপস্থিত সকলকে মিষ্টিমুখ করানো হয়। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতির বিষয়ে সকলেই গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সংগঠিত হয়ে আগামী দিনের পথ চলার ব্যাপারে সকলেই একমত হন।

ফঃ ৪

ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবাজীর জন্মতিথিতে ‘দেশের মাটি’র তুলসী বন্দনা

প্রতি বছর দেশজুড়ে অনুষ্ঠিত হয় ‘তুলসীপূজন দিবস’। তুলসী বন্দনার অন্যতম কারণ, গাছটির অসাধারণ ভেষজ গুণ। সনাতনী সংস্কৃতিতে তুলসীর অতি-সামীপ্যও এক আরেকটি কারণ। অনুষ্ঠিতব্য তুলসীপূজনের প্রেক্ষিতে কয়েক

মাস পূর্ব থেকেই ধারাবাহিকভাবে তুলসী বিষয়ক নানান কার্যক্রম আয়োজন করে চলেছে ‘দেশের মাটি কল্যাণ মন্দির’। গত ২৬ অক্টোবর ছিল তুলসী মাহাত্ম্য ও পূজন বিষয়ক এক মহতী আলোচনা সভা। উত্তর ২৪ পরগনার সুখচর কাঠিয়াবাবার আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয় এই সভা; নিবেদিত হয় বৈদান্তিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদী যোগসাধক তথা বাঙ্গালি দার্শনিক ও নিম্বার্ক-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরার ৫৬তম আচার্য স্বামী ধনঞ্জয়দাস বাবাজীর স্মরণ-মননের মাধ্যমে। এদিন উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করা হয় তুলসীর চারা।

এদিনের অনুষ্ঠানে উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল কৃষিবিজ্ঞানী ড. কল্যাণ চক্রবর্তীর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাণীপালন বিজ্ঞানী ড. রাসবিহারী ভড়, মহিষাদল গার্লস্ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. উৎপল উত্থাসনী, কাঠিয়াবাবা আশ্রমের ট্রাস্টি সন্দীপ ঘোষ, আশ্রম সদস্য বিশ্বনাথ শেঠ, ভোকেশনাল কলেজের অধ্যাপক সুবল চন্দ্র ঘোষ, সমাজসেবী অরিন্দম ঘোষ, দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের সম্পাদক মিলন খামারিয়া প্রমুখ। এদিন আশ্রমে ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘তুলসীকথা’ বইটি প্রদর্শিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কয়েকটি বই বিক্রির অর্থরাশিতে দেশের মাটি নানান সেবাকাজ পরিচালনা করে চলেছে। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন মিলন খামারিয়া। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন প্রমিতি রায়।

সুখচর কাঠিয়াবাবার এই আশ্রমটি গঙ্গার পূর্বতীরে এক মনোরম পরিবেশে অবস্থান করছে। মন্দিরে রয়েছে রাধাবৃন্দাবনবিহারীর মূর্তি। গুরু-গোবিন্দ-গঙ্গা- গায়ত্রী-গোমাতা— এই পঞ্চ ‘গ’-এর সঙ্গমস্থল এই আশ্রম। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজ। তাঁরই পুণ্য জন্মতিথিতে সুখচর আশ্রমে আয়োজিত হয় উৎসব। আশ্রমের মোহন্ত স্বামী বৃন্দাবনবিহারী দাস বাবাজীর অনুমতিক্রমে দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের তুলসীপূজন এবং তুলসী মাহাত্ম্য বিষয়ক আলোচনাসভাটি এদিন অনুষ্ঠিত হয়।

দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের সম্পাদক মিলন খামারিয়া সংবাদমাধ্যমকে জানান, এ বছর মৌসুমি বর্ষার সূত্রপাত থেকেই দেশের মাটি সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং ছোটো ছোটো সভাস্থলে বার্তা দিয়েছে— তুলসীতলায় অঙ্কুরিত বীজভাণ্ডার যে অসংখ্য চারার জন্ম দেয়, তা তুলে ফেলে বা নষ্ট না করে, যত্ন সহকারে ছোটো পলিপ্যাকেটে স্থানান্তরিত করে প্রতিবেশী, স্বজন-বান্ধব এবং নানান সনাতনী, হিতবাদী সংগঠনগুলির হাতে যেন তুলে দেয় হিন্দুরা। এই প্রক্রিয়ায় যেন তাঁরা তুলসী মাহাত্ম্যের প্রচার ও প্রসার করেন। যত আগ্রহী মানুষের কাছে তুলসীর চারা পৌঁছে দেওয়া যাবে, ততই তুলসীপূজন অনুষ্ঠান সাফল্যলাভ করবে।

দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের মুখ্য উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, তুলসীপূজন কেবল একদিনের অনুষ্ঠান নয়। বছরভিত্তিক তুলসীর ক্রমবর্ধমান চারার জোগান, তুলসীর গুণাবলী সম্পর্কে ধারণার মতো বিষয়গুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্প্রসারণে সারাবছর ধরেই সচেতনতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে দেশের মাটি। বর্ষাকালই চারা তৈরির আদর্শ সময়। বর্ষায় তুলসী চারা বিনষ্ট না করে আঞ্চলিকভাবে বিতরণের চেষ্টা চালাচ্ছে এই সংগঠনের সদস্যমহল। যত সময় যাবে, ততই মানুষ সচেতন হবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তুলসী মাহাত্ম্য প্রচার করবে। অধ্যাপক চক্রবর্তী আরও বলেন যে, প্রত্যেক হিন্দুকে গীতা ও তুলসীর স্বয়ং-প্রচারক হতে হবে।

মালদায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্য একত্রীকরণ ও বিজয়া সম্মেলন

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ মালদা নগর প্রখণ্ডের ৮টি নতুন খণ্ড সমিতি গঠিত হয়েছে। গত ২৬ অক্টোবর বিজয়া ও দীপাবলী সম্মেলনের সঙ্গে ৮টি খণ্ড সমিতির সদস্যদের একত্রীকরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় মালদা বিভাগ কার্যালয়ে। ক্ষেত্র সামাজিক সমরসতা অভিযান প্রমুখ গৌতম সরকার দ্বারা প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এদিন অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। মালদা নগর প্রখণ্ডের সভাপতি সুজন দাসের স্বাগত ভাষণের পর প্রান্ত সেবা টোলির সদস্য গোপাল কুণ্ডু অধিকারীদের পরিচয় এবং পরিষদের স্থাপনা থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ ও সাংগঠনিক ব্যবস্থার বর্ণনা দেন। সৎসঙ্গের কার্যক্রম এবং তার সুর, শুদ্ধ উচ্চারণের সঙ্গে সংগঠনের আগামী কার্যক্রম সম্পর্কে বলেন প্রান্ত সহ-সংগঠন সম্পাদক বুবাই নস্কর। জেলার কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক তাপস সুকুল। শেষে বিজয়া দশমীর মাহাত্ম্য, হিন্দু ও হিন্দুত্বের ব্যাখ্যা এবং সংগঠনের অন্তিম লক্ষ্য— ভারতকে বিশ্বগুরুর স্থানে অধিষ্ঠানের বিষয়ে কার্যকর্তাদের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন পরিষদের পূর্বক্ষেত্র সামাজিক সমরসতা প্রমুখ গৌতম সরকার। অনুষ্ঠানে মাতৃশক্তির উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। মোট ৪৩ জন কার্যকর্তার উপস্থিতিতে সংঘটিত এই উৎসাহবর্ধক কার্যক্রম সমবেত কণ্ঠে শান্তি মন্ত্রোচ্চারণের পর সমাপ্ত হয়। সবশেষে সহভোজের ব্যবস্থা ছিল।

ডীডওয়ানা নাগরিক সভার দীপাবলী প্রীতি সম্মেলন

কলকাতার ডীডওয়ানা নাগরিক সভার উদ্যোগে গত ২৫ অক্টোবর স্থানীয় হিন্দুস্থান ক্লাবের সভাগারে দীপাবলী প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং হিন্দুস্থান ক্লাবের অধ্যক্ষ সঞ্জয় গোয়েঙ্কা। মঞ্চাসীন ছিলেন ওমপ্রকাশ বাঙ্গর, রাজগোপাল পসারী, ঈশ্বর ধ্যাওয়ালা ও দিনেশ অগ্রওয়াল। অনুষ্ঠানে প্রথমে বিশিষ্ট শিল্পপতি হেমন্ত বাঙ্গরকে 'ডীডওয়ানা গৌরব সম্মান'-এ ভূষিত করা হয়। তাঁকে তিলক, মালা ও শাল পরিয়ে তাঁর হাতে শ্রীফল, মানপত্র ও রৌপ্যপদক তুলে দেওয়া হয়। তারপর মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের 'স্বর্গীয় মগনীরাম পসারী স্মৃতি শিক্ষা প্রতিভা সম্মান'-এ ভূষিত করা হয়। এবারে সিএ, সিএস, ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়ার ডিগ্রিধারীদের শিক্ষা প্রতিভা সম্মান প্রদান করা হয় তাদের হাতে রৌপ্য পদক ও শংসাপত্র তুলে দিয়ে।

ডীডওয়ানা গৌরবে সম্মানিত হয়ে শ্রীহেমন্ত বাঙ্গর ডীডওয়ানা নাগরিক সভার কাজের প্রশংসা করে বলেন, বিগত ৭১ বছর ধরে সমাজ সেবা করে যাওয়া এবং রাজস্থানের ডীডওয়ানা শহরের বিকাশের জন্য সহায়তা করে যাওয়া খুব বড়ো কাজ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংস্থার মন্ত্রী হরিশ তিয়াড়ী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্থার অধ্যক্ষ অরুণ মল্লাবত।

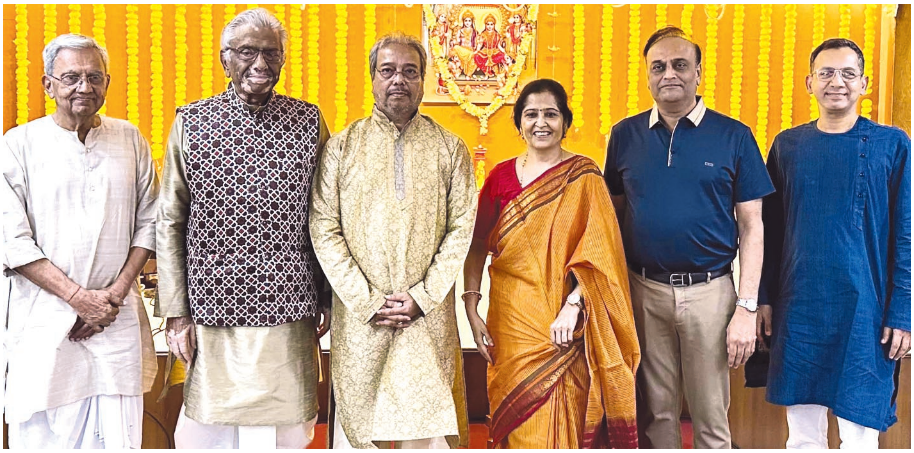

ভারতীয় সংস্কৃতি সংসদের দীপাবলী প্রীতি সম্মেলন

ভারতীয় সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে গত ২৬ অক্টোবর তাদের নিজস্ব কার্যালয়ে শ্রীরাম রাজ্যাভিষেক এবং দীপাবলী প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংস্থার কর্ণধার রাজগোপাল সুরেকার পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুষ্ঠান স্থল শ্রীরামদরবারে আদলে সাজানো হয়েছিল। জনপ্রিয় গায়ক ওমপ্রকাশ মিশ্র রামচরিতমানসের উত্তরাখণ্ডে বর্ণিত শ্রীরামরাজ্যাভিষেক সম্পর্কিত চৌপাইয়া ও দোঁহা ছন্দোবদ্ধভাবে গেয়ে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে দেন। সংস্থার উপাধ্যক্ষ ডঃ তারা দূগড় বলেন, ভগবান শ্রীরাম পুনর্নবা। মানুষের ভেতরে যা কিছু সুন্দর তাই-ই শ্রীরাম। শ্রীরাম আমাদের জীবনের কণায় কণায় প্রতি মুহূর্তে বিরাজমান। সমাপ্তি ভাষণে বিজয় ঝুনঝুনওয়ালা সংগীতময় স্বরে বর্ণনা করেন যে ঈশ্বরের কাছে আমাদের কী প্রার্থনা করতে হবে।

সঙ্ঘ শতবর্ষের যোজনায় ব্যারাকপুর জেলায় বিশিষ্ট নাগরিক সম্মেলন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষের যোজনায় গত ৬ অক্টোবর স্থানীয় গান্ধী মিউজিয়াম প্রেক্ষাগৃহে ব্যারাকপুর জেলায় প্রথম বিশিষ্ট নাগরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ব্যারাকপুর ও তৎসংলগ্ন এলাকার ৩৪০জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সম্মেলেনে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার বি এন বর্মন, এইউজিপি ইউএসএ-এর অবসরপ্রাপ্ত শান্তি রাষ্ট্রদূত প্রফেসর রাজদীপ দত্ত, অখিল ভারতীয় পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের রাজ্য সহসভাপতি লেঃ কর্নেল শান্তিভূষণ দাস, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার অসীম বিশ্বাস, ব্যারাকপুর জার্নালিস্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক টিভি ৯ বাংলার সিনিওর জার্নালিস্ট অনন্ত চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, চিকিৎসক, আইনজীবী, সাহিত্যিকরাও ছিলেন। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন পদ্মশ্রী ডাঃ জগদীশচন্দ্র হালদার এবং প্রধান বক্তা রূপে ছিলেন সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল।

ভারতে শক্তিসাধনার ইতিহাস

ড. অনিমেষ চক্রবর্তী

(তৃতীয় পর্ব)

দেবী ত্রিপুরসুন্দরী অথবা ষোড়শী—দেবী কালিকাই ষোড়শী, আবার তিনিই ত্রিপুরসুন্দরী অথবা মহাত্রিপুরসুন্দরী। সর্বদা শ্রী প্রদান করেন বলে দেবীকে শ্রীবিদ্যাও বলা হয়। নারদপঞ্চরাত্র থেকে জানা যায়, একদা স্বর্গের অপ্সরাগণ কৈলাস পর্বতে শিবকে দর্শন করতে যান। শিব অপ্সরাদের সামনেই দেবীকে 'কালী কালী' বলে ডাকেন, এতে দেবী লজ্জা পেয়ে মনে মনে স্থির করেন তিনি কালীরূপ ত্যাগ করে গৌরীরূপ ধারণ করবেন। এই উদ্দেশ্যে দেবী কৈলাস থেকে অন্তর্হিতা হয়ে সুমেরু পর্বতের উত্তর পার্শ্বে অবস্থান করেন।

দেবর্ষি নারদ একদিন শিবের সঙ্গে দেখা করতে এসে দেবীর কথা জিজ্ঞেস করলেন এবং সুমেরু পর্বতে গিয়ে অনেক স্তবস্তুতি করে দেবীকে প্রসন্ন করলেন। দেবীর প্রশ্নের উত্তরে নারদ তাঁর স্বভাব অনুযায়ী দেবীকে বললেন যে, দেবাদিদেব আবার বিবাহের উদ্যোগ করছেন। মা তুমি গিয়ে তা বন্ধ করো। দেবী তখন অপূর্ব সুন্দরী রূপ ধারণ করে শিব সকাশে উপস্থিত হয়ে শিবের হৃদয়ে নিজের ছায়া দেখতে পেলেন। কিন্তু দেবী সেই ছায়ামূর্তিকে নিজের বলে চিনতে না পেরে মহেশ্বরকে নানাভাবে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। মহাদেব বললেন, দেবী ধ্যানস্থ হয়ে জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখ আমার হৃদয়ের ওই ছায়াটি তোমারই। দেবী তখন তা দেখে শান্ত হলেন। দেবাদিদেব বললেন, দেবী ত্রিভুবনে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ ধারণ করেছ বলে তুমি স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে সর্বত্র সুন্দরী পঞ্চমীশ্রী এবং ত্রিপুরসুন্দরী নামে প্রসিদ্ধ হবে। সদা সর্বথা ষোড়শবর্ষীয়া বলে ষোড়শী নামেও জগতে বিখ্যাত হবে।

রক্ত,শুক্ল, মিশ্র এই ত্রিবিন্দু;মাতা, মান, মেয় তিন রূপ; ত্রিধাম সোম সূর্য অগ্নি; ত্রিপীঠ কামরূপ, জালন্ধর, পূর্ণগিরি; ত্রিশক্তি ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া। বান ইতর পর ত্রিলিঙ্গ অকথ নামক ত্রিধাভিন্ন মাতৃকাত্রিতর। ত্রিবিধাত্মক সর্বপ্রপঞ্চের আবির্ভাব ও তিরোভাব ভূমি বলে পরাশক্তিকে ত্রিপুরা নামে অভিহিত করা হয়।

দেবীর মণ্ডল ত্রিকোণ, ভূপুর ত্রিরেখ, মন্ত্র ত্র্যক্ষর। তাঁর রূপও ত্রিবিধ। কুণ্ডলীশক্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, এই ত্রিদেবের সৃষ্টিতেই ত্রিবিধা হন।

দেবী সর্বদা শ্রী প্রদান করেন তাই তিনি শ্রীবিদ্যা। দেবী নির্গুণা বলে ষোড়শী। এই দেবী ষোড়শীকেই মহা ত্রিপুরসুন্দরী বলা হয়।

দেবী ষোড়শীকে আরাধনার আগে দেবী অন্নপূর্ণা ভৈরবী মন্ত্র, শ্রীবিদ্যামন্ত্র ও লোপামুদ্রা মন্ত্র সম্পর্কে জানা আবশ্যক। ষোড়শীদেবীর বীজবলী সর্বতন্ত্রে গোপিত। ব্রহ্মযামল, সিদ্ধযামল, রুদ্রযামল প্রভৃতি থেকে মহাষোড়শী মন্ত্র জানা যায়।

দেবী ষোড়শীর স্তবরাজি ও দেবীস্তোত্রের পর দেবীকবজ পাঠ বিধেয়। দেবী ষোড়শীর বাগভব, কামরাজ ও শক্তিবীজ এই তিনটি কূট বা বীজ আছে। দেবী ষোড়শীর কবচের দক্ষিণামূর্তি ঋষি, পঙ্ক্তি ছন্দ, ত্রিপুরসুন্দরী দেবতা, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ লাভের জন্য এই কবচ পাঠ বিধেয়। এই দেবীকবচ দেবতাদেরও দুর্লভ। এই কবচ পাঠ করলে মানুষের সর্বসিদ্ধি এবং সর্বকামনা পূর্ণ হয়। ব্যাধিভয়, পাতকভয়, মহামারীভয় থাকে না। দরিদ্রতা থাকে না, এমনকী মৃত্যুরও বশীভূত হয় না। শ্রীবিদ্যা জপে এই কবচ জানা অপরিহার্য।

দেবী ভুবনেশ্বরী—দেবী এই বিশ্বভুবনের পালন করেন। সৃষ্টি- স্থিতি-লয় করেন, ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সর্বজ্ঞ ও সর্বনিয়ন্তা বলেই দেবীকে ভুবনেশ্বরী নামে ডাকা হয়। দেবী ভুবনেশ্বরী জগতের দুঃখকে সংহত

করেন; ভয় ভীতি দূর করেন, সৃষ্টি করেন, আবার সৃষ্টির বীজসকল কুড়িয়ে রাখেন।

ভুবনানাং পালনত্বাদ্ভুবনেশী প্রকীর্তিতা।
সৃষ্টিস্থিতিকরী দেবী ভুবনেশী প্রকীর্তিতা।।

—প্রাণতোষিণী, বসুমতী সং, পৃ.—৩৭৪

মহাদেবী মহাকালী যেমন, তেমনই দেবী ভুবনেশ্বরীও আধার পদ্মে শায়িতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তির অভিন্ন রূপ। কুণ্ডলিনী শক্তির অখণ্ডস্বরূপ বিচ্ছুরিত হলে শরীরের অন্তর্দেশে পরাপশ্যন্তি মধ্যমা এবং বহির্দেশে বৈখরী প্রকাশিত হয়।

দেবী ভুবনেশ্বরীর শরীর শ্যামবর্ণ, কপালে অর্ধচন্দ্র, দেবী চতুর্ভুজা, চারহাতে বরমুদ্রা, রক্তোৎপল, পানপাত্র ও অভয়মুদ্রা। দেবী স্তনভারে নম্র। দেবীর গলদেশে মুক্তাহার, দেবী ত্রিনেত্রা, রক্তপদ্মের উপর বসে আছেন। শারদাতিলকে দেবীর বর্ণনা এরকম—

শ্যামাঙ্গীং শশীশেখরাং নিজকরৈর্দানং চরক্তোৎপলং
রত্নাঢ্যং চষকংপরং ভয়হরং সংবিভ্রাতীং শাস্বতীম্।
মুক্তাহারলসৎপয়োধরনতাং নেত্র ত্রায়োল্লাসিনীং
বন্দেহহং সুরপুজিতাং হরবধূং রক্তারবিন্দস্থিতাম্।

দেবী ভৈরবী—দেবী ভৈরবী এই জগতের, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভরণপোষণ, পালন করেন। সৃষ্টি সমূহের সকল ক্রিয়াকাণ্ডের পরিচালনা করেন এবং প্রলয় বা মহাপ্রলয়ের পর সৃষ্টির বীজসকল আবার বপন করেন এজন্যই দেবীকে ভৈরবী বলা হয়। দেবী কালভৈরবের ভার্যা। দেবী যমদুঃখ বিনাশ করেন।

দেবী ভৈরবীর অনেক রূপ ও অনেক নাম। ত্রিপুরা ভৈরবী, সম্পদপ্রদাভৈরবী, কৌলেশভৈরবী, সিদ্ধিকাভৈরবী, ভয়বিধ্বংসিনী ভৈরবী, চৈতন্যভৈরবী, কামেশ্বরীভৈরবী, ষটকূটাভৈরবী, নিত্যাভৈরবী, রুদ্রভৈরবী, ভুবনেশ্বরী ভৈরবী, অন্নপূর্ণেশ্বরীভৈরবী।

তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভাং বালেন্দুকৃতশেখরাং।
নবরত্ন প্রভাদীপ্ত মুকুটাং কুঙ্কুমারুণাং।
....সানন্দমুখলোলাক্ষীং মেখলাঢ্যাং নিতম্বিনীং।
অন্নদানরতাং নিত্যাং ভুমিশ্রীভ্যামলঙ্কৃতাং।

—বৃ. তন্ত্রসারঃ, পঠ.—৩১৪-১৫

দেবী অন্নপূর্ণা ভৈরবী তাঁর সন্তানদের অন্নপান জোগান দেন। দেবী সর্বথা ভূমি ও শ্রীর সঙ্গে যুক্ত; এটাই দেবীর অলংকার। তিনিই নৃত্যশীল উদাস উদাত্ত মহাদেবকে অন্নদান করেন। সমস্ত জগৎ, সমস্ত জাতি, সমস্ত নরনারী দেশীয় অন্নের উপর র্নিরশীল। শারদীয়া দুর্গাপূজার পর কোনো কোনো জায়গায় দেবী অন্নপূর্ণা ভৈরবীর পূজা হয় অন্নকূট উৎসব নামে। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরও মা অন্নপূর্ণার মন্দির ভুবন বিখ্যাত।

দেবী প্রচণ্ডচণ্ডিকা অথবা দেবী ছিন্নমস্তা—দেবী ছিন্নমস্তার রূপকল্প ভারতের ধর্মের ইতিহাসে এক অতি অপূর্ব উপস্থাপনা। দেবী প্রচণ্ডচণ্ডিকা বা দেবী ছিন্নমস্তার রূপকল্পের সঙ্গে নাথতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের সরাসরি মিল দেখতে পাওয়া যায়।

নারদপঞ্চরাত্র অনুসারে দেবী ছিন্নমস্তার একটি উদ্ভব কাহিনি এ প্রসঙ্গে বলা দরকার। একদিন দেবী পার্বতী ডাকিনী ও বর্ণিনী নামে দুই সহচরীকে নিয়ে মন্দাকিনীতে স্নান করতে যান। স্নানের পর তারা দেবীর কাছে খাদ্য চান। দেবী তাদের অপেক্ষা করতে বলেন। কিন্তু তারা ক্রমশ খাদ্যের জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকায় দেবী নখাগ্রের দ্বারা নিজমস্তক ছিন্ন করেন। তখন দেবীর গলদেশ থেকে তিনটি রক্তধারা প্রবাহিত হয়। দেবী বামদিকের রক্তধারা দেন ডাকিনীর মুখে, ডানদিকের রক্তধারা দেন বর্ণিনীর মুখে, আর মধ্যধারা নিজমুখে ধরেন। এই রক্তপানের কাজ শেষ করে তাঁরা যেমন এসেছিলেন তেমনই চলে গেলেন। দেবীর মুণ্ড ছিন্ন হওয়ায় দেবী ছিন্নমস্তা নামে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন।

দেবী ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী করালবদনা হলেও দেবী সুপ্রসন্না ও বরপ্রদানকারী। দেবী নিজের মুণ্ড ছিন্ন করে সুষুম্না পথে প্রবাহিত ঊর্ধ্বগামী রাক্তধারা পান করছেন। মস্তকে সহস্রারে সেই রক্তধারা পরমশিবের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক আনন্দ মহানন্দময় মুক্তি ও সিদ্ধি লাভ করছে।

আর ইড়া ও পিঙ্গলায় প্রবাহিত রক্তধারা পান করছে বর্ণিনী ও ডাকিনী। এই ইড়া ও পিঙ্গলা দিয়েই যত বাসনাময় জন্মমৃত্যু পাশ সম্ভূত আসা-যাওয়া। এই জায়গাতেই নাথদের চন্দ্র ও সূর্য তত্ত্ব (ইড়া ও পিঙ্গলা)। এটি রূদ্ধ হলে তবেই অমৃতলোকে যাত্রার পথ প্রশস্ত হয়।

নাথদের এক হেঁয়ালিতে দেখা যায়—

চন্দা গোটা খুটা করিলেউ
সুরজকে করিলেউ পাট
নিতি নিতি ধোবী ধোবই ত্রিবেণীকে ঘাট।

অর্থাৎ চাঁদকে খুটা করা হয়েছে আর সূর্য যেন ধোবার কাপড় কাচার পাট বা পাটাতন। এই দুটো শক্ত ও স্থির হলেই ধোপা কাপড় কাচতে পারবে। কোথায় সে কাপড় কাচবে ত্রিবেণীর ঘাটে। ত্রিবেণী অর্থে প্রয়াগ, গঙ্গা, যমুনা, স্বরস্বতীর মিলনস্থল। মানব শরীরে এই স্থান হলো মূলাধার। ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না নাড়ীর মিলনস্থল। মানব শরীরে এই তিনটিকেই গঙ্গা যমুনা সরস্বতী নামে ভারতীয় হিন্দু তন্ত্রে প্রতীকায়িত করা হয়।

তন্ত্রে সাধনায় দেহ ও দেহভাণ্ড খুব গুরুত্বপূর্ণ। বৌদ্ধ সহজিয়ারাও কোনো তত্ত্বকেই দেহের বাইরে মনে করেন না। সরহপাদের দোহায় আছে—

এথথু সে সুরসরি যমুনা হথথু সে গঙ্গা-সাঅরু।
এথথু প আগ বণারসি এথথু সে চন্দ দিবাঅরু।।

—এখানে এই দেহেই সুরেশ্বরী গঙ্গা ও যমুনা। এখানেই গঙ্গাসাগর তীর্থ। এখানেই প্রয়াগরাজ বারাণসী। এখানেই চন্দ্র দিবাকর।

সর্বত্রই উজান পথে যাওয়ার কথা। এই জীবনতরীকে উজান পথে, উলটো পথে টেনে নিতে হবে। এখানেই দেবী কৃপা প্রয়োজন, তাহলেই শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি হয়। মা মহামায়ার সাধন, ওই কুণ্ডলিনীই কালী, মা মহামায়া। তিনিই হিন্দু তন্ত্র অনুসারে দেশ হয়েছেন, জগৎ হয়েছেন। তিনিই দশমহাবিদ্যা, তিনিই ভারতমাতা, তাঁর কৃপাছাড়া হবে না।

দেবী ধূমাবতী—দেবী ধূমাবতীর উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নরকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। দু-একটি উল্লেখযোগ্য।

স্বতন্ত্রতন্ত্র থেকে জানা যায়—সকল কিছু সংহার করার মানসে দেবী প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞকুণ্ডে নিজদেহ আহুতি দিলেন এবং তার ফলে বিরাট ধূমরাশি উৎপন্ন হলো। সেই ধূম থেকেই সর্বশত্রু সংহারিণী দেবী ধূমাবতীর উদ্ভব হলো।

নারদ পঞ্চরাত্র থেকে দেবী ধূমাবতীর আর একটি উদ্ভব কাহিনি পাওয়া যায়। একদা দেবী দেবাদিদেব মহাদেবকে বললেন, আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত, আমাকে খেতে দাও। শিব তাঁকে অপেক্ষা করতে বললেন। বারংবার বলার পর দেবী আর অপেক্ষা করতে না পেরে স্বামীকে ধরে মুখে পুরে দিলেন। মুহূর্ত মধ্যে দেবীর দেহ থেকে ধূমরাশি উদ্ভূত হলো। শিব মায়ার দ্বারা পুনরায় দেহ ধারণ করে বললেন—দেবী শাখা সিঁদুর পরিত্যাগ করো। তোমার শরীর ধূম দ্বারা ব্যাপ্ত হবার জন্য তোমাকে ধূমাবতী বলা হবে।

আবার আর এক জায়গায় দেখা যায়, দেবী মহামায়া ধূমাবতী ধূম্রাসুর বিনাশিনী। দেবী ধূম্ররূপা চতুর্বর্গফলপ্রদা।

দেবী বগলামুখী—স্বতন্ত্রতন্ত্র থেকে জানা যায়— সত্যযুগে অতি প্রবলভাবে বায়ু প্রবাহিত হবার ফলে বিশ্বচরাচর ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার আশঙ্কা তৈরি হয়। এই বায়ুবেগ রোধ করার জন্য বিষ্ণু তপস্যা দ্বারা দেবী মহাত্রিপুরাসুন্দরীকে প্রীত করেন এবং দেবীর কৃপায় বায়ুবেগ রুদ্ধ হয়ে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসে।

দেবী স্তম্ভন (রুদ্ধ) বা রোধ কারকতা বিষয়েই আরাধিতা। যেকোনো রকম বায়ুবিকার থেকেই তিনি ভক্তকে রক্ষা করেন।

দেবী বগলামুখী গম্ভীরাকৃতি, সর্বদা মদোন্মত্তা। সুবর্ণের মতো কান্তিযুক্ত দেহ, চারহাত ও ত্রিনয়ন। দেবীর স্তনযুগল দৃঢ় ও স্থূল। দেবী পীতবস্ত্র পরিধান করে হেমকুণ্ডলে বিভূষিত হয়ে রত্ন সিংহাসনের উপরে পদ্মাসনে উপবিষ্টা। দেবীর কপালে পীতবর্ণ অর্ধচন্দ্র। ডানদিকের দুইহাতে মুদ্গর ও পাশ। বামদিকের দুই হাতে মদনাসুরের জিহ্বা ও বজ্র । দেবীর অঙ্গের ভূষণ সকলও পীতবর্ণ ও ভীষণাকার।

—গম্ভীরাঞ্চ মদোন্মত্তাং স্বর্ণকান্তি সমপ্রভাং
চতুর্ভুজাং ত্রিনয়নাং কমলাসন সংস্থিতাং।
মুদ্গরং দক্ষিণে পাশং বামে জিহ্বাঞ্চ বজ্রকং।
পীতাম্বরধরাং দেবীং দৃঢ়পীনপয়োধরাং।
হেমকুণ্ডলভূষাঞ্চ পীতচন্দ্রার্দ্ধশেখরাং।
পীতভীষণপূষাঞ্চ রত্নসিংহাসনে স্থিতাং।

—বৃহৎ তন্ত্রসারঃ, পৃ. ৪৬৬

দেবী মাতঙ্গী—দেবী সকল সময় সকল বিপদ থেকে তাঁর ভক্তদের বাঁচান। দেবীর মদশীলত্বের জন্য এবং তিনি মতঙ্গাসুরকে বিনাশ করেছিলেন বলে দেবীকে মাতঙ্গী নামে অভিহিত করা হয়।

ছয় রকমের মাতঙ্গীর নাম পাওয়া যায়। যথা—দেবী মাতঙ্গী, দেবী উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনী বা দেবী উচ্ছিষ্ট মাতঙ্গী; দেবী সুমুখী-মাতঙ্গী; দেবী কর্ণমাতঙ্গী, দেবী বশ্যমাতঙ্গী, দেবী রাজমাতঙ্গী।

দেবী কমলা বা দেবী লক্ষ্মী—দেবী কমলা এবং দেবী লক্ষ্মী একই দেবী। তবে দেবী যদি বৈকুণ্ঠবাসিনী হন, তাঁকে বলা হয় কমলা, অন্যদিকে দেবী পাতালবাসিনী হলে তিনি দেবী লক্ষ্মী নামে বিভূষিতা। কুব্জিকাতন্ত্রে বলা হয়েছে—

বৈকুণ্ঠবাসিনী দেবী কমলা চ প্রকীর্তিতা।
পাতালবাসিনী দেবী লক্ষ্মীরূপা চ সুন্দরী।

দেবী লক্ষ্মী সকল রকম সম্পদ ও সৌভাগ্য প্রদান করেন।

স্বতন্ত্রতন্ত্র অনুসারে এই দেবীই ক্ষীরোদসমুদ্র মন্থনের থেকে উঠেছিলেন এবং বিষ্ণুবক্ষস্থিতা পদ্মাসনগতা রমা ইনিই। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে এই দেবী থেকে কোলাসুর বিনাশিনী মহামাতঙ্গী নামক কলা উৎপন্ন হন। ফাল্গুনমাসের শুক্র বা মঙ্গলবারে একাদশী তিথিতে সকল সৌভাগ্যদায়িনী দেবী মহালক্ষ্মী প্রকাশিত হন।

পুরাব্রহ্মাজগৎ স্রষ্ঠুং তপোহতপ্যত দারুণম্।
তপসা তস্য সন্তুষ্টা শক্তি সা পরমেশ্বরী।
চৈত্রশুক্লনবম্যান্তু উৎপন্না তারিণী স্বয়ম্।
ক্রোধরাত্রিঃ সমাখ্যাতা সর্বশক্তিময়ী শিবা।
জাতা তস্যাং মহালক্ষ্মীঃ সর্বসৌভাগ্যদায়িনী।

মাতৃমূর্তি রচনার এই যে প্রেরণা, এই যে প্রবণতা, এসব শুধুমাত্র শাশ্বত বা সনাতন ধর্মীয় বৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ নয়। আসলে এর সঙ্গে রয়েছে জীবনধারণ সংক্রান্ত পার্থিব প্রয়োজন ও নিরাপত্তার তাগিদ। সেই প্রয়োজনের তাগিদেই সুদূর অতীতে ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এক জাতীয় ধ্যানধারণা ও বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল।

মাতৃসাধনা, কুলকুণ্ডলিনী সাধনা, যোগসাধনা, লতা সাধনা, দশমহাবিদ্যা সাধনা প্রভৃতি সবই মাতৃসাধনা। এই মাতৃকামূর্তি ও মাতৃসাধনা সম্ভবত প্রাথমিকভাবে মেয়েদের দ্বারাই উদ্ভূত হয়েছিল।

আবার অন্যদিকে আদিম মানুষের ভেতর নানারকম সামাজিক অনুষ্ঠানে অথবা নৃত্যগীতের সময় কারও ভেতর এক তীব্র মানসিক শক্তি বা আবেগের স্ফুরণ দেখা যায়। যার ফলে তিনি তার মানসলোকে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান দেখতে পান এবং কিছু কিছু বলতেও পারেন যা ভবিষ্যতে সত্য বলে প্রমাণিত হয়। এইরকম অবস্থাকে এক যোগযুক্ত অবস্থা বলেই পরবর্তীতে বলা হয়েছে।

মহেঞ্জোদারোতে যেমন যোনি মূর্তি পাওয়া গেছে, তেমন একটি যোগীর মূর্তিও পাওয়া গেছে। যোগের ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান মূর্তি পাওয়া গেছে। এগুলি দেবমূর্তি হতে পারে। একটি সিলমোহরে নারী জননাঙ্গ থেকে একটি লতা বা গাছ বেরিয়েছে। একে প্রকৃতি ও প্রকৃতির উৎপাদিকা শক্তি, এবং জগৎ প্রসবকারিণী ও জগৎ পালনকারিণী শক্তির পরিচায়াকও বলা চলে।

আবার অন্যদিকে ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্ত থেকে জানা যায় ঋষি বা মুনি বা যোগী অনেকেই ছিলেন, যাঁরা অতীন্দ্রিয় পদার্থ দর্শন করতে পারতেন। এঁরা পিঙ্গলবর্ণ বস্ত্র পরিধান করতেন। তাঁরা ছিলেন তপস্বী এবং জপতপের শক্তি ও মহিমায় উদ্ভাসিত, উন্নত ও শক্তিমান হয়ে তাঁরা বায়ুপথে গমনাগমন করতে পারতেন। তাঁরা বাতাসের গতিতে চলতে পারতেন। যথা—

মুনয়ো বাতরশনাঃ পিশঙ্গা বসতে মলা।
বাতস্যানু ঘ্রাজিং যন্তি যদ্দেবাসো অবিক্ষত।

—ঋগ্বেদ, ১০, ১৩৬, ২

এইসব যোগী ও মুনিগণ লৌকিকতা ও সামাজিকতার বাইরে ছিলেন। খানিকটা উন্মাদের মতো আচরণ করতেন। (পরমযোগী হয় বালকবৎ, পিশাচবৎ, উন্মাদবৎ)। এঁরা বলতেন আমরা উপাসনা করি বলেই বায়ু, জল, পৃথিবী অবস্থান করছে। মানুষেরা আমাদের শুধু শরীররূপ দেখতে পায়, আমাদের দেখতে পায় না। (অর্থাৎ আমি আত্মা, পরমাত্মার আংশবিশেষ)। যথা—

উন্মাদিতা মৌনেয়েন বাতা আ তস্থিমা বয়ম্

শরীরেদস্মাকং যুয়ং মর্তাসো অভি পশ্যথ।

—ঋগ্বেদ; ১০, ১৩৬, ৩

এঁরা বায়ুপথে চলাচল করতে পারতেন ও রুদ্রের সঙ্গে বসে বিষপান করতেন। (গাঁজা, ভাঙ, ধুতরো পান করতেন বোধ হয়।)

যথা—

বায়ুরস্মা উপামন্থৎ পিনষ্টি স্মা কুনংনমা।

কেশী বিষস্য পাত্রেণ যদ্‌রুদ্রেণা পিবৎসহ।

—ঋগ্বেদ, ১০.১৩৬.৭

আবার অন্যদিকে ভারতবর্ষে নব্যপ্রস্তর যুগ ও তার পরবর্তী সময়ে কৃষি উৎপাদন, কৃষিকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান সন্তান ও মাতৃপ্রাধান্য, তা থেকেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে নানা ধরনের জাদুবিশ্বাস। কৃষি উৎপাদন ও সন্তান উৎপাদন এবং এই সংক্রান্ত নানা বিষয়ের জন্য সমগ্র সমাজ ও জাতি মেয়েদের উপরই নির্ভর করেছে। তন্ত্রের দেবী তাই সর্বশক্তির আধার। সকল মায়াশক্তি প্রকৃতি শক্তি। আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক সকল রকম অসুবিধার নিরসনকারী দেবী শক্তি। তাই তন্ত্রে খপুষ্প, স্বয়ম্ভুকুসুম, কুণ্ডোদ্ভব, গোলোদ্ভব, বজ্রপুষ্প এসব বিষয়ের ব্যবহার। আর যন্ত্র বলে যেটা বলা হয় (সর্বতভদ্রমণ্ডলযন্ত্রম, চৈতন্যভৈরবীযন্ত্রম, নিত্যযন্ত্রম্ প্রভৃতি) তা দেবীর মাতৃস্থানেরই চিত্রায়িত পূজনীয় রূপ। মানবীয় ফলপ্রসূতা ও প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতার সম্পর্ক, জাদুবিশ্বাস এসব থেকেই তন্ত্রে লতা, কুসুম, পুষ্প, পদ্ম, (অষ্টদল, যোড়শদল, দ্বিদল, সহস্রদল, শতদল প্রভৃতি পদ্ম) বীথিকা এসব পরিভাষা তৈরি হয়েছে।

শস্যবৃদ্ধির কামনায় ভারতবর্ষে অনেক জায়গায় মেয়েরা অতি গোপনে, খালি পায়ে ফসল ক্ষেতের পাশে গিয়ে হাঁটে। খালিপায়ে এলোচুলে দৌড়ে তিনবার ক্ষেত প্রদক্ষিণ করে; জুলুদের মধ্যেও এরকম প্রথা আছে। গ্রিক পূজায় অনুষ্ঠানে পূজারিণীরা খালিপায়ে এলোচুলে হাঁটে। অন্তঃসত্ত্বা মেয়েরা গাছ লাগায়। গাছের প্রথম ফল খেতে দেওয়া হয় তাদের। অনেক জায়গায় ফসল ক্ষেতের পাশে গিয়ে নারী পুরুষ রাত্রিবাস করে, এরকম নানা প্রথা দেখা যায়।

গৌড়বঙ্গে একজাতীয় কৃষিজীবী মানুষের ভেতর প্রথা আছে কার্তিক মাসের অমবস্যায়, কালীপূজার রাতে, বাড়ির বউ মেয়েরা নগ্ন হয়ে দুটো কাঠি দিয়ে কুলো বাজায় এবং বাজাতে বাজাতে, নাচতে নাচতে বাড়ি প্রদক্ষিণ করে অতি গোপনে। এসব প্রার্থনার সঙ্গে নগ্নতার কী সম্পর্ক; এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। কিন্তু ওই এক বিশ্বাস, জাদুবিশ্বাস। এভাবেই, তাদের মনে বিশ্বাসের শক্তিকে তীব্র করে, আর এসবের লক্ষ্য থাকে দেবী কালিকার কৃপা লাভ। এরকম প্রচুর অনুষ্ঠানের উদাহরণ দেওয়া যায়।

ভারতবর্ষে এক প্রাচীন, অতি প্রাচীন যোগ সাধন পদ্ধতি প্রথম থেকেই বিদ্যমান। আবার প্রাকৃতিক উৎপাদন, শস্য, অন্ন, সন্তান কামনাও প্রথম থেকেই বিদ্যমান। পৃথিবীর সর্বত্রই বিদ্যমান। যে শক্তির নিম্নগামিতায় সন্তান, গৃহসুখ, কামনা বাসনা তৈরি হয়। সেই শক্তিরই ঊর্ধ্বগামিতায় সহস্রার চক্রে শিব-শক্তির মিলনে মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যায়। এই সমন্বয়ী তত্ত্বের কথাই ব্যাখ্যা করে, হিন্দুতন্ত্র, নাথতন্ত্র, সহজিয়াতন্ত্র, বৈষ্ণবতন্ত্র, বৌদ্ধতন্ত্র প্রভৃতি। এগুলি সবই প্রকৃতপক্ষে হিন্দু সাধনার বিভিন্ন দিক ও ধারা। ভারতে শক্তি সাধনার ধারণা ও ব্যাখ্যা ভারতীয় জীবনবোধের ব্যাখ্যা। ভারতের জনসমাজে মহাশক্তির এই দুই ধারার সমন্বয়ী চরিত্রের ও বৈশিষ্ট্যের ভেতর দিয়েই ক্রমঅগ্রসরমান। দেবী দশমহাবিদ্যা ভারতের হিন্দুতন্ত্রের এক অপূর্ব সৃষ্টি। ভুক্তি ও মুক্তির মেলবন্ধন।

ভক্তের (সন্তানের) ভাব অনুসারে দেবী লীলাময়ী, নিত্য ক্রিয়াশীল। তিনি সকল প্রার্থনা, সকল কামনা, বাসনা, সকল রকম চিন্তা ও ভাবের ভেতর সূক্ষ্ম ও স্থূল রূপে বিরাজ করছেন। আবার সাধক ও যোগী হৃদয়ে ও জীবনে তিনি কুলকুণ্ডলিনীরূপে অনন্ত শাশ্বত পরমশিব ও পরমাত্মার দিকে গমনশীল শক্তি, মহাশক্তি, মহাবিদ্যা। তিনিই দেবী শাকম্ভরী। তিনি চণ্ডী, তিনিই দুর্গা, সকল শক্তিপূজার সাধ্যা তিনিই। তিনিই কালী তিনিই ব্রহ্ম।

ততোহহমকিলং লোকমাত্মদেহ সমুদ্ভবৈঃ

ভবিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টে প্রাণধারকৈঃ।।

শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যামহং ভুবি।

—মার্কণ্ডেয় পুরাণম্, ৯২, ৪৩-৪

হিন্দুতন্ত্র, বৌদ্ধতন্ত্র, নাথতন্ত্র, বৈষ্ণবতন্ত্র, সহজিয়া, আউল, বাউল সকলের সাধনবস্তু ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন প্রবচনে ওই একই—মা মহামায়া অথবা কুলকুণ্ডলিনী কামকলা ও তার ঊর্ধ্বগামিতা। পরম শিবই পরমাত্মা। এখানেই সমাধি। একেই উলটা সাধন, উজান বাওয়া, গোপন কথা বা গোপন তত্ত্ব, অচিনপাখি প্রভৃতি নানা নামে, নানাভাবে বিভিন্ন গানে কথায় সাধন প্রসঙ্গে বলা হয়। এই সকল কিছুর মূলতন্ত্রী মা মহামায়া। তিনি মহাশক্তি, মা আদ্যাশক্তি কুলকুণ্ডলিনীরূপে সাধক জীবনে অধিষ্ঠিতা। তিনিই সর্বত্র দশমহাবিদ্যারূপে বিরাজিতা। তিনিই জগৎ হয়েছেন। আবার তিনিই এই জগতের মধ্যে বাস করেন। মায়ের কথা বলতে যে আনন্দ তা কোনো ভাষা দিয়েই বোঝান যায় না।

তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্

সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।।

সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।

সংসার বন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী।।

—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১:৫৬-৫৮

কৃষিভিত্তিক উৎপাদনশীলতা ও নারীপ্রাধান্য, মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ ও মাতৃপ্রাধান্য প্রভৃতি থেকেই সম্ভবত মাতৃকামূর্তি ও মাতৃকা উপাসনা গড়ে উঠেছিল ভারতবর্ষে, বহু প্রাচীন যুগে নব্য প্রস্তর যুগের সমসময়ে। কৃষি উৎপাদন ও মানবীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে শিব ও শক্তি উপাসনা ভারতবর্ষে উচ্চস্থানে বিরাজমান।

এর পাশাপাশি বিকশিত হয়েছিল ভারতের এক যোগ সাধন ব্যবস্থার ধারা। ভারতের ধর্ম ইতিহাসে এই দুইয়ের মেলবন্ধন হয়েছে ভারতের হিন্দু তন্ত্রে ও শক্তি সাধনায়। এর সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে দেবীর প্রতি নানা পূজা ও ব্রত, বিশ্বাস, জাদুবিশ্বাস ও ভাব। ভারতবর্ষের সকল তন্ত্রে এই ধারণা ও সাধনার কথাই বিবৃত। ভারতের মাতৃসাধকেরা যুগ যুগ ধরে এই মাতৃসাধনাকে পুষ্ট ও বিকশিত করেছেন। এই দেবীই একাধারে দেশমাতৃকা ও ভারতমাতা। তিনি ভুক্তি ও মুক্তি দুই প্রদান করেন। আনন্দ প্রদান করেন মা আনন্দময়ী, তাঁর সন্তানকে ও সাধককে।

(সমাপ্ত)

রাষ্ট্রচেতনার সূতিকাগার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখায়

দুর্গাপদ ঘোষ

অনেকে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক-কার্যকর্তাদের কাছে জানতে চান, সঙ্ঘে এলেন কেন? এত রকমের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও সঙ্ঘে কেন? এক্ষেত্রে নানা জনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে এবং স্বাভাবিকভাবেই এক-এক রকম। আমার ৬২ বছরের (২০২৫) সঙ্ঘজীবনের প্রেক্ষিতে মনে হয় সঙ্ঘে কেন এলাম এই প্রশ্নের পাশাপাশি আরও একটা বড়ো প্রশ্ন হলো, কীভাবে এলাম। সেই সঙ্গে এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আসাটা একরকম কিন্তু তারপর সঙ্ঘের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে এত নিবিড় ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্পৃক্ত রইলাম কেন? কী আছে সঙ্ঘের মধ্যে! আমার এই ৬ দশকেরও বেশি সময়ের সঙ্ঘ জীবনে যাকে আমি আমার 'দ্বিতীয় জন্ম' বলে মনে করি, বাধাবিপত্তি, প্রতিকূলতা তো কিছু কম আসেনি! ১৯৭৫ ও ১৯৯৩ সালে দু'দুবার রাজনৈতিক অভিসন্ধি নিয়ে সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাজার হাজার স্বয়ংসেবক কারাবন্দি হয়েছেন। তাছাড়াও নিরন্তর সঙ্ঘের বিরুদ্ধে বহু রকমের অপপ্রচার চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশের লোকেরা আমার বাড়ির দরজায় এসে কড়া নেড়ে হেনস্থা করেছে।

অন্যদিকে, একাধিক মহল থেকে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নানা রকমের সুযোগ সুবিধা লাভ করার প্রলোভন, বিশেষ করে রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে কিছু কম আসেনি। কিন্তু সে সমস্ত কিছুকে যথাক্রমে উপেক্ষা করে এবং পাশ কাটিয়ে, ক্ষেত্রবিশেষে তুচ্ছ করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নামের বিশাল বটবৃক্ষের শাখা-প্রশাখার মতো বহু বিস্তৃত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একান্ত ভাবে একাত্ম হয়ে রয়েছি। কেন? কিন্তু কোনো কোনো প্রশ্ন থাকে যার উত্তর সহজে দেওয়া যায় না। এক কথায় তো নয়-ই।

সঙ্ঘের ৩৮ এবং আমার ১৮ বছর বয়সে সঙ্ঘের শাখায় আসি। তখন বিশেষ কিছু প্রবুদ্ধ ও রাজনৈতিক মহল ছাড়া অনেকেই সঙ্ঘের পুরো নাম সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। অনেকেই কেবল 'শাখা' বলে জানতেন এবং একটি অতি শৃঙ্খলাপরায়ণ প্রতিষ্ঠান মনে করতেন। এখন সমগ্র ভারত ছাড়াও বিশ্বের ৩৯টি দেশে পুরোদমে সঙ্ঘের কাজ চলছে। ভারতের বাইরে সবচাইতে বেশি শাখা চলছে নেপালে। তারপর আমেরিকায়। সেখানে ১৪৬টি শাখা চলে। ব্রিটেনে শাখার সংখ্যা ৮৪টিরও বেশি। কেনিয়া ও মরিশাস-সহ আফ্রিকার বেশকিছু দেশেও সঙ্ঘের কাজ খুব ভালো। এখন এমনকী মধ্যপ্রাচ্যেও দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করছে। অন্য দেশগুলিতে অবশ্য 'রাষ্ট্রীয়'-র বদলে 'হিন্দু' স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ অভিধায় চলে এবং খাকি হাফ প্যান্টের জায়গায় গণবেশে পরা হয় কালো রঙের ফুলপ্যান্ট। প্রার্থনার শেষে বলা হয়ে থাক 'হিন্দুধর্ম কী জয়'। এবার বিজয়াদশমীর সময় সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে দেশ দেশে বিশাল বিশাল পথসঞ্চলন করে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। কানাডা থেকে কেনিয়া, জাপান, ইউরোপ থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বহু দেশের রাজপথগুলিতে সঙ্ঘের গণবেশ (ইউনিফর্ম) পরিহিত স্বয়ংসেবকরা রুটমার্চ করে সমগ্র

ফঃ ৫

বিশ্বকে বিস্মিত করে দিয়েছেন। এর আগে বিশ্ববাসী সঙ্ঘের 'বিশ্বরূপ'— এরকম বহিঃপ্রকাশ দেখেনি। এটা কীভাবে সম্ভব হলো তার উত্তর যেমন সহজ নয় তেমনি আমার মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ কেন ও কীভাবে সঙ্ঘে এসেছেন এবং মনেপ্রাণে সঙ্ঘের মধ্যে একনিষ্ঠ ভাবে নিজেকে নিবেদিত করেছেন তার উত্তরও মনে হয় অনেকেই সহজে দিতে পারবেন না। তবুও কোথাও প্রবেশের ও অবস্থানের একটা না একটা কারণ তো থেকেই যায়!

কেবল সঙ্ঘের আদর্শগত দিক নয়। বিশ্বের বৃহত্তম অরাজনৈতিক সমাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের দেবতুল্য কার্যকর্তাদের সততা, নির্মল চরিত্র, ত্যাগ, অসীম সংযম এবং প্রাণঢালা আন্তরিকতার পাশাপাশি পারিবারিক সম্মানবোধ ও মধুর ব্যবহার আমার মতো বহুজনকে আকৃষ্ট করেছে এবং আঁকড়ে রেখেছে বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। যে সম্পর্কের বন্ধনে একবার জড়ালে আর বিচ্ছিন্ন হওয়া যায় না। সঙ্ঘের এই সম্পদ যেন মাধ্যাকর্ষণের মতো এক অদৃশ্য মহাশক্তি। আমার মনে হয় সঙ্ঘে এহেন বহুমুখী ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতির মূল শক্তি এটাই। এছাড়া সঙ্ঘে রাষ্ট্রচেতনার বিষয়টি তো রয়েছেই।

আমি ছোটোবেলা থেকেই স্বামী বিবেকানন্দের অনুরাগী। দেশভক্তি ও দেশসেবার মূল তত্ত্বকে কেন্দ্র করে সমাজ সংগঠিত করা এবং দেশকে পরম বৈভবশালী, রাষ্ট্রচেতনায় পরিব্যাপ্ত ও শ্রেষ্ঠত্বে প্রতিষ্ঠিত করার যে লক্ষ্য স্বামীজীর ছিল, আমার সঙ্ঘজীবনের প্রায় প্রথম ধাপ থেকেই মনে হয়েছে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজীই ছিলেন তার উপযুক্ত আধার, প্রধান রূপকার। যতদূর জানি, স্বামীজীর জীবনে সনাতন হিন্দু সমাজকে মহাশক্তিরূপে সংগঠিত করে হিন্দু জাতীয়তাবোধের ভাবাদর্শে দেশকে পুনরায় বিশ্বগুরুর আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে দুটি মিশন ছিল। এক, যাঁরা সংসার জীবন থেকে বেরিয়ে এসে সন্ন্যাসী হয়ে সেই কাজ করবেন। আর দ্বিতীয়টি ছিল, সমাজের বৃহত্তম অংশ, গৃহীর জীবনযাপনকারীদের স্বেচ্ছায় অর্থাৎ স্বয়ংসেবক রূপে, সমাজসেবক হিসেবে সংগঠিত করা। সবাইকে একাত্ম মনোভাবে ঐক্যবদ্ধ করা। তাঁর প্রথম মিশনের ফলিত প্রয়োগ ১৮৯৭ সালের ১ মে তিনি নিজের হাতেই করে গেছেন রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করে। দ্বিতীয় মিশন কার্যকর করার সময় তিনি পাননি। নিঃসন্দেহে তাঁর অকালপ্রয়াণের কারণে। স্বামীজীর সেই দ্বিতীয় মিশনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার কাজ যা আরও কঠিন এবং অত্যন্ত দুরূহ তা শুরু করেন ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার। ১৯২৫ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর বিজয়া দশমীতে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সূচনার মাধ্যমে। তবে এসব অতি গভীর ও আদর্শগত তাত্ত্বিক বিষয়ের কণামাত্র অনুধাবন করেছি অনেক করে, সঙ্ঘের মধ্যে থাকতে থাকতে। কিন্তু সবার আগে হয়েছে সঙ্ঘ জীবনে প্রবেশ করা। তারপর মিশতে মিশতে মিশে যাওয়া।

ইংরেজি ১৯৬৩ সালটা আমার কাছে একাধিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। মধ্য কলকাতায় বঙ্গবাসী সান্ধ্য কলেজে তৎকালীন প্রি-ইউনিভার্সিটি ক্লাসের ছাত্র থাকাকালে লেবুতলা পার্কে (এখন সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার) সঙ্ঘের শাখায় আসা। তার আগেই কলেজে একজন সক্রিয় তরুণ হিসেবে বামমার্গী ছাত্র সংগঠনের নেতাদের খপ্পরে পড়ে ছাত্র-রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া। সেখান থেকে এক প্রকার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বেরিয়ে আসা। সেবছরই স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম শতবর্ষকে কেন্দ্র করে কন্যাকুমারিকার বিবেকানন্দ শিলায় তাঁর স্মৃতিমন্দির নির্মাণের জন্য গঠিত স্মারক সমিতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া। বর্ধমানে রাজবাড়ির কাছে মহন্তস্থলে সঙ্ঘের শিক্ষাবর্গে এক মাসের জন্য যোগ দেওয়া এবং সে বছরের নভেম্বরে এক মাসের জন্য সঙ্ঘের বিস্তারক হিসেবে মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জে গিয়ে শাখা চালু করা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এদের মধ্যে কলেজে কিছু সময়ের জন্য ইউনিয়নভুক্তি ছাড়া বাকি সবগুলোই সঙ্ঘ সম্পর্কিত।

লেবুতলা পার্কের এক কোণে এবং মুচিপাড়া থানার ঠিক সামনে একটা তালগাছতলায় রোজ বিকেলে গেরুয়া পতাকা উত্তোলন করে শাখার কার্যক্রম মানে কবাডি, লাঠি ইত্যাদি খেলাধুলা, প্রার্থনা হতো। এককথায় যাকে বলে ব্যবস্থিত শাখা হতো। অনেকেই লম্বা লম্বা লাঠি নিয়ে আসত। মাঝে মাঝে কলেজে যাবার আগে পার্কের রেলিঙের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। সেবার মকর সংক্রান্তির কয়েকদিন আগে সঙ্ঘের প্রার্থনা এবং 'ভারতমাতা কী জয়' ধ্বনির পর সেদিনের মতো শাখাশেষে সবাই যখন যে যার মতো চলে যাচ্ছে তখন খাকি হাফপ্যান্ট এবং স্যান্ডো গেঞ্জি পরা প্রায় আমারই সমবয়সি একজন যে তখন ওই শাখার শিক্ষক ছিল, মধুসূদন দত্ত আমার কাছে এসে নামধাম জানতে চেয়ে পরিচয় করল। কোনোরকম ভনিতা না করে সরাসরি বলল, মকর সংক্রান্তির দিন বিকেলে এই মাঠে (এখন যেখানে খুব বড়ো করে দুর্গাপূজা হচ্ছে) আমাদের উৎসব আছে। পূর্ণ গণবেশে। তুমিও যোগ দাও না! ছাত্র-রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে তখনই যাকে বলে বেশ কইয়ে বলিয়ে চালু ছেলে হয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটু নেতাগিরির ভঙ্গিতে বললাম, আমি কলেজে ইউনিয়ন করি। মধু হেসে বলল, তাতে কী হয়েছে, আমাদের শাখায় সবাই আসতে পারে। তার আগে সঙ্ঘ সম্পর্কে আমার স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ একটা হিন্দু সংগঠন এইটুকুই মাত্র শুনেছিলাম। মনে করতাম সে তো ভলোই! হিন্দুরা নিজেদের মতো সংগঠন করবে তাতে অন্যদের ভালো-মন্দের তো কিছু নেই! আমরা পূর্ববঙ্গ থেকে ভিটেছাড়া হয়েছি মুসলমান নেতাদের দ্বি-জাতি তত্ত্ব এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে। খুলনার কাছে দৌলতপুরে আমার বাবার কাঠের গোলা জেহাদিদের আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যাবার পর প্রাণ বাঁচাতে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। তার পরেও তা কোনোরকম বিদ্বেষের মনোভাব না নিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকছি। এখনও দেখছি হিন্দু সংগঠন'-এর লোকেরা বলছে তাদের শাখায় সবাই আসতে পারে। তখনই জানিয়ে দিলাম— ঠিক আছে। কিন্তু ওই যে কী একটা বেশ ড্রেসের কথা বললে সেটা আবার কী? মধু বলল, 'গণবেশ', সঙ্ঘের ইউনিফর্ম। হঠাৎ একেবারে তুমি থেকে তুই-এ এসে বলল, ঠিক আছে... ঠিক আছে, তোকে এখন ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। কিন্তু জুতোটা তো ঠিক তোর পায়ের মাপের লাগবে। তোকে কিন্তু এই বুটটা কিনে নিতে হবে। পুরনো হলেও চলবে। পরে শুনেছিলাম শঙ্কর নামে আমার মতো পাতলা গড়নের একজনের অতিরিক্ত এক সেট গণবেশ আমাকে পরানো হয়েছিল। মধু নিজের প্রায় নতুন বেল্টটা আমাকে পরিয়ে নিজে পুরনোটা পরেছিল। সেই সঙ্গে কারও একজনের পুংলি-পট্টি।

তার আগে একদিন সন্ধ্যার পর শিয়ালদার চোরা মার্কেটে নিয়ে গিয়ে হয় পুলিশ কিংবা মিলিটারিদের একজোড়া পুরনো বুটজুতো কিনে দিয়েছিল ৫ কিংবা ৬ টাকায়।

উৎসব শুরুর ঘণ্টাখানেক আগে আমাকে সেসব পরিয়ে এবং একটা দণ্ড এনে শরীরের পিছন দিকে বাঁ হাতে উলম্বভাবে কী করে ধরতে হয় সেই কৌশল শিখিয়ে আরও কয়েক জনের সঙ্গে আমাকেও রক্ষী হিসেবে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে মধু নিজের কার্যক্রমে যোগ দিতে চলে গিয়েছিল। ব্যাপারটা সেদিন আমার কাছে বেশ রোমাঞ্চকর লাগছিল। সেই সঙ্গে সেদিন আর একটা ব্যাপার আমাকে অভিভূত করেছিল। আমাদের কলেজে ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন প্রখ্যাত ব্যায়ামবিদ 'আয়রন ম্যান' নীলমণি দাস। আগে থেকেই নানা ছবি এবং ক্যালেন্ডারে তাঁর পেশি ফোলানো চেহারা দেখে রীতিমতো পুলকিত বোধ করতাম। কলেজে সামানাসামনি তো খুবই সমীহ করতাম। সেদিন উৎসবে সেই মানুষকেও পূর্ণ গণবেশে উপস্থিত থাকতে দেখে একেবারে বিস্ময়াভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। শাখায় তাহলে এরকম সব মানুষরাও আছেন! আমিও এঁদের একজন এটা ভেবে নিজেকে বেশ গৌরবান্বিত মনে হচ্ছিল। সেদিনই মধুর কাছে জেনেছিলাম উনি ছিলেন সঙ্ঘের বিবেকানন্দ নগরের (মধ্য কলকাতা) সঙ্ঘচালক। সেই শুরু। সেখান থেকেই রাষ্ট্র আরাধনার সূতিকাগারে আমার দ্বিতীয় জন্ম হলো।

পরদিন বাড়ি থেকে সোজা কলেজে গিয়ে ইউনিয়নের 'দাদা'-দের কাছে সব বলতেই তারা প্রায় রণংদেহী মূর্তি ধারণ করে বলে দিল, ওসব আরএসএস-টারএসএস করলে ইউনিয়নে থাকা চলবে না। ইউনিয়ন থেকে বার করে দেওয়া হবে বলে হুমকিও দিল। তার পরদিন বিকেলে শাখায় এলাম। সেই আমার প্রথম শাখায় আসা। কারণ তার একদিন আগে উৎসবে দাঁড়িয়েছিলাম বটে কিন্তু শাখার কার্যক্রমে অংশ নিইনি। মধু সব শুনে বলল, ঠিক আছে তুই ৬ মাস দেখ্। কাউকে কিছু না বলে কলেজে ইউনিয়নও কর, রোজ শাখাতেও আয়। তারপর যেটাকে ভালো ও সঠিক মনে করবি সেটা করবি। সেদিন ওর কথা শুনে খানিকটা অবাকই হয়েছিলাম। একপক্ষ বলছে আরএসএস করলে ইউনিয়নে থাকা যাবে না। অন্য পক্ষ বলছে তুমি ইউনিয়ন করলেও আরএসএস করতে পারো। সঙ্ঘের এই সর্বংসহা মানসিকতার কাছে আত্মনিবেদন করে একাত্ম হতে সময় লাগেনি। তখন বুঝিনি। পরে অনুভব করেছি সঙ্ঘ চায় সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রের মানুষ দেশপ্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হোক, একনিষ্ঠ দেশভক্ত হোক।

মাস কয়েক পরে ইউনিয়নের নেতা ভীম-দা (পুরো নাম মনে নেই) একদিন আলাদা করে ডেকে বলল, বস্তুত প্রলোভনের ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে বলল, তোকে কলেজ ইউনিয়নের এজিএস (সহকারী সাধারণ সম্পাদক) করা নিয়ে পার্টির নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। তখনই জানিয়ে দিলাম আমি আর ইউনয়নে থাকব না। আরএসএস করব। ভীমদা শাসালো, তাহলে তোকে কিন্তু ভুগতে হবে। আমারও জিদ চেপে গেল। বুক বাজিয়ে, চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ইউনিয়ন ছেড়ে চলে এলাম। মুখের ওপর বলে এলাম কাল থেকে সঙ্ঘের হাফ প্যান্ট পরেই কলেজে আসব। কয়েকদিন তা করলামও। ভীম বাহিনী তা নিয়ে প্রিন্সিপ্যাল মনোরঞ্জন করে নালিশ জানালে তিনি আমাকে তাঁর চেম্বারে ডেকে বললেন, এটা কো-অ্যাডুকেশন কলেজ। মেয়েরাও পড়তে আসে। তুমি আর যাই পরো হাফপ্যান্ট পরে এসো না। বললাম, ধুতি পরে আসতে পারি? একটু ভেবে সম্মতি জানালেন। এরপর পুরো প্রথম বছর ধুতি-শার্ট পরে ক্লাস করেছিলাম। তখন সঙ্ঘের গণবেশে ফুলহাতা সাদা শার্ট পরতে হতো। বুকচেরা শার্ট অনুমোদিত ছিল না। আর যখনই ধুতি-শার্ট পরে কলেজে যেতাম কেন জানি না নিজেকে সঙ্ঘেরই একজন বলে মনে হতো। আমার ওই চ্যালেঞ্জটা ছিল যেন সঙ্ঘেরই চ্যালেঞ্জ।

আরও একটা ঘটনা আমার মনকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছিল। সম্ভবত সে বছরের এপ্রিল মাস ছিল। একদিন মধু আমাকে বলল, আজ বিকেলে হাওড়া স্টেশনে নিয়ে যাব। একজনকে দেখে তোর কী মনে হলো বলবি। কৌতূহল চেপে রেখে রাজি হয়ে গেলাম। তখনও শাখা ও ইউনিয়ন দুটোই করি। সেদিন প্রথম দর্শন করলাম শুভ্র বসন পরিহিত এবং একটা কাঠের কমণ্ডলু হাতে একজন ঋষিতুল্য ব্যক্তিকে। যিনি ছিলেন স্বামীজীর গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দের কাছে দীক্ষিত এবং যাঁর সমগ্র জীবনের সাধনমন্ত্র ছিল রাষ্ট্র আরাধনা। ট্রেন থেকে একগাল হাসিমুখে নেমে আসা মানুষটিকে দেখে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। তিনি দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী। মধুর কাছে তাঁর সম্পর্কে দু'এক কথা শুনে ছিলাম কিন্তু বশিষ্ঠ মুনির মতো ছিপছিপে গড়নের এই ঋষিবরই যে তিনি, সামনাসামনি দেখেও তা ভাবতে পারিনি। মধু সেখানে কলকাতা মহানগর প্রচারক কেশবজীর (স্বর্গত কেশবরাও দীক্ষিত) সামনে নিয়ে গিয়ে আমার পরিচয় দিল। কেশবজী বললেন, এই মধু, শ্রীগুরুজীর কথা শোনার জন্য ওকে নিবাসে (২৬, বিধান সরণি) নিয়ে আসিস। পরদিন সেইমতো নিবাসে গেলাম। এতদিন ইউনিয়ন করছি, কোনোদিন কেউ কোনো হাফ নেতার কাছেও ঘেঁষতে দেয়নি। আর মাত্র মাস তিনেক হতে না হতে স্বয়ং সরসঙ্ঘচালকের সামনাসামনি হবার সৌভাগ্য! সঙ্ঘ অতি সাধারণ স্বয়ংসেবকদেরও এতখানি গুরুত্ব দেয়, সম্মান দেয়! এরপর ইউনিয়নে থাকব না সঙ্ঘ করব, স্থির সিদ্ধান্ত নিতে দেরি লাগেনি।

স্বামী বিবেকানন্দ শিলা স্মারক সমিতির সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে একনাথজী রানাডের মতো ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসা এবং তাঁর 'Rousing call to Hindu nation' গ্রন্থ রচনার সময় নিজের হাতে তাঁর সেবা করার সৌভাগ্য লাভ, নিবাসে থাকাকালে পিতৃতুল্য কেশবজীর স্নেহের বাঁধনে পড়া, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা দত্তোপন্ত ঠেংড়ীর মতো মানুষের সঙ্গে পায়ে হেঁটে কলকাতা শহরে ঘোরা, ভবেন্দু ভট্টাচার্যর মতো বহুমুখী প্রতিভার সাংবাদিক-সাহিত্যিকের অনুপ্রেরণা লাভ ইত্যাদি আমাকে একটা নতুন জীবনের সঞ্জিবনীসুধার স্বাদ দিয়েছে। সঙ্ঘের শাখায় এসেছি এক ভাবে। কিন্তু সঙ্ঘের আদর্শের কিঞ্চিৎমাত্র হৃদয়ঙ্গম করেছি ক্রমে ক্রমে, কালে কালে। পরিশেষে কেবল এইটুকুই বলতে চাই, যে মহানতা সঙ্ঘকে আজ শতায়ু করেছে সঙ্ঘের মধ্যে না আসা বহু উচ্চশিক্ষিত মানুষও তা বোধহয় সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। সনাতন হিন্দু রাষ্ট্রের জন্য সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজী কী করে গেছেন তা আজ যদি আর একজন ডাক্তারজী থাকতেন তাহলে তিনিই বোধহয় সবথেকে ভালো বুঝতেন। □

বঙ্গপ্রদেশে শ্রীগুরুজী ঃ কিছু স্মৃতিকথা

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বের সর্ববৃহৎ সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও সেবামূলক সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবার বিজয়া দশমীর দিন শতবর্ষ পূর্ণ করেছে। সঙ্ঘের সূচনা ভূমি যদি নাগপুর হয়, তবে অনুপ্রেরণার স্থল অবশ্যই এই বঙ্গভূমি। কেননা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজী যেমন অনুশীলন সমিতির কর্মকাণ্ডে যুক্ত থেকে বঙ্গভূমি থেকেই বিপ্লবী আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তেমনই পাশাপাশি সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকার বা শ্রীগুরুজীর সঙ্ঘ কার্যের প্রেরণাও ছিল এই বঙ্গভূমি। শ্রীগুরুজী বঙ্গে প্রথম আসেন ১৯৩৬ সালে, দীপাবলীর সময়। তার আগেই ১৯৩৪ সালে তিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ছেড়ে নাগপুরে চলে আসেন। নাগপুরে তাঁর সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের যোগাযোগ ছিল। শ্রীগুরুজী তাঁর প্রবল আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণের জন্য মুর্শিদাবাদের সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশনে আসেন এবং স্বামী অখণ্ডানন্দের কাছ থেকে ১৯৩৭ সালের ১৩ জানুয়ারি, মকর সংক্রান্তির দিন দীক্ষা লাভ করেন। মিশনের কাজ এবং স্বামী অখণ্ডানন্দের সেবায় শ্রীগুরুজী দিন যাপন করতে থাকনে। তবে এই সময় স্বামী অখণ্ডানন্দজী খুব অসুস্থ হলে তাঁকে বেলুড়ে স্থানান্তরিত করা হয়। ৭ ফেব্রুয়ারি তিনি পরলোকগমন করেন। তার আগে তিনি শ্রীগুরুজীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, নাগপুরে ফিরে গিয়ে সঙ্ঘকাজের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্র সেবা করার। শ্রীগুরুজী শেষদিন পর্যন্ত এই নির্দেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেছেন।

১৯৩৯ সালের মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধা জেলার সিন্দি গ্রামে এক চিন্তন বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডাক্তারজী শ্রীগুরুজীকে

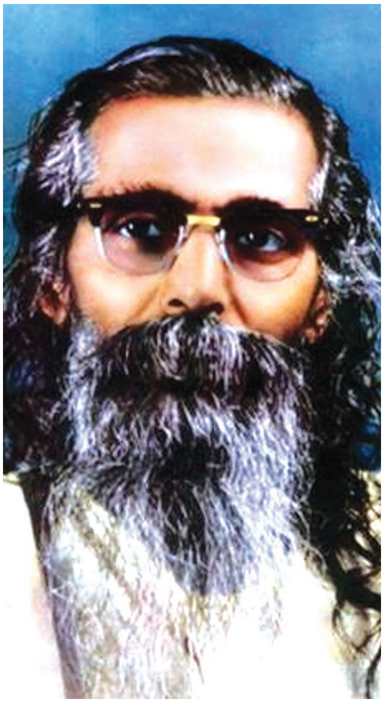

কলকাতায় সঙ্ঘের কাজ বিস্তারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। শ্রীগুরুজী ১৯৩৯ সালের বর্ষ প্রতিপদের দিন ১ নং সরকার লেনে বঙ্গের প্রথম সঙ্ঘ শাখা আরম্ভ করেছিলেন। এরপর ১৯৪০ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত ৩৩ বছরে তিনি অন্তত ৭৫ বার বঙ্গে এসেছিলেন। ১৯৩৯ সালে তিনি যখন বঙ্গে এসেছিলেন তখন তার পকেটে সম্বল মাত্র কুড়ি টাকা। তাই ট্রামে-বাসে না চড়ে সারা কলকাতা পায়ে হেঁটেই তিনি সঙ্ঘ কাজ করতেন।

শ্রীগুরুজী যতবার বঙ্গে এসেছেন ততবার স্বয়ংসেবকরা তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখবার ও জানবার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁরা শ্রীগুরুজীকে নিয়ে ছোটো ছোটো বহু অভিজ্ঞতার কথা লিখে রেখে গেছেন। যেমন— ১৯৫১ সালে শ্রীগুরুজীর কলকাতায় আসবার কথা। ২৬ নম্বর কার্যালয়ের দরজা-জানলা স্বয়ংসেবকরা পরিষ্কার করছেন। কিছুক্ষণ বাদে তারা লক্ষ্য করলেন শ্রীগুরুজীও তাদের সঙ্গে নীরবে সাফাইয়ের কাজে হাত লাগিয়েছেন। মানে তিনি আগের ট্রেনেই চলে এসেছেন।

১৯৫৪ সালে শ্রীগুরুজী শিলিগুড়ি এসেছিলেন। সেবার নাগরিক বৈঠকে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান-সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। চেয়ারম্যানের শ্রীগুরুজীকে প্রশ্ন, 'আপনি তো বলেন সঙ্ঘ রাজনীতি নিরপেক্ষ। অথচ আপনি প্রধানমন্ত্রীর সবচেয়ে বেশি সমালোচনা করেন।' উত্তরে শ্রীগুরুজী বলেন, 'মদ তো অনেকেই খায় তবে মন্দিরের পূজারি যদি খায়, তাহলে?' এই উত্তরে গোটা কক্ষ নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

১৯৬৫ সালে শ্রীগুরুজী মালদা এসেছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ মহারাজ এসেছিলেন। শ্রীগুরুজীর সঙ্গে প্রথম আলাপেই তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি বালুরঘাট ও হিলিতে শাখা করার জন্য ভালো ভালো লোকের নাম দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি আধুনিক বিবেকানন্দকে দেখেছি'।

১৯৬৫-৬৬ সালে শ্রীগুরুজী কলকাতা এসেছেন। তাঁর আসার খবর শুনে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২৬ নম্বর বিধান সরণীর কার্যালয়ে আসেন শ্রীগুরুজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তিনি বলেন, 'আপনি এদিকে হিন্দু সংগঠন করছেন আর ওই দিকে দিল্লিতে হিন্দু বিরোধী সরকার গঠিত হয়েছে। আপনি সঙ্ঘকে রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত করুন।' উত্তরে শ্রীগুরুজী বলেন, আপনি করছেন না কেন? ড. শ্যামাপ্রসাদ জানান, 'আমার

বয়স ৫০। এই বয়সে আমার একার পক্ষে কি এ কাজ করা সম্ভব?' শ্রীগুরুজী বলেন, 'আপনি শুরু করুন। আমি আপনাকে প্রতি প্রদেশ থেকে দুজন করে কার্যকর্তা দেব।' এভাবেই জন্ম নেয় ভারতীয় জনসঙ্ঘ।

১৯৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে বৈঠক নেওয়ার সময় শ্রীগুরুজী একবার প্রশ্ন করেছিলেন, 'কারা কারা বিয়ে করে সংসারী হতে চাও? কয়েকজন হাত তুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, অবশ্যই বিয়ে করে সংসারী হওয়া উচিত। তবে এই জন্মে নয়, পরের জন্মে সাত-সাতটি বিয়ে করবে।'

১৯৭০ সালে কলকাতার উলটোডাঙ্গায় একবার স্বয়ংসেবকদের বিরাট সমাবেশ হচ্ছে। প্রধান বক্তা শ্রীগুরুজী। এক স্বয়ংসেবক লাইনের শেষের দিকে বসে ছবি তোলার চেষ্টা করছিলেন। শ্রীগুরুজী ভাষণ থামিয়ে নির্দেশ দেন ক্যামেরাটি নিয়ে নেবার জন্য। এটা অনুশাসনের প্রশ্ন।

১৯৫৯ সালে হাবড়া সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে কার্যকর্তাদের বৈঠক চলছিল। বৈঠকে কয়েকজন কার্যকর্তা দৈনিক শাখা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। শ্রীগুরুজী বলেন, 'যারা ক্লান্ত তারা অবসর নিতে পারেন। আবার আমি বালকদের নিয়ে শুরু করব।'

কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক বড়ো কার্যক্রম। প্রধান বক্তা শ্রীগুরুজী। সভার শেষে তিনি ঘনশ্যামজীর বাড়িতে ফিরে এক প্রবীণ স্বয়ংসেবকদের অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইলেন। এক কার্যকর্তা জানালেন তার ১০০ ডিগ্রি জ্বর। ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে। তাই অনুপস্থিত। শ্রীগুরুজীর তখন ১০৩ জ্বর। সঙ্গে অসম্ভব মাথার যন্ত্রণা। তাই নিয়ে তিনি ভাষণ দিয়েছেন, কার্যক্রম সম্পূর্ণ করেছেন। এই হলেন শ্রীগুরুজী।

শ্রীগুরুজী বর্ধমান সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে এসেছেন। ওখান থেকে সোজা বোম্বাই যাবেন। সেখানে ক্যানসার অপারেশন হবে। ক্যানসার রোগীর অসম্ভব যন্ত্রণা হয়। সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে গুরুজী সমস্ত কার্যক্রম নিলেন। বৌদ্ধিক, চর্চা সবই হলো। মাঝে মাঝে শুধু বুকে হাত বোলাচ্ছেন। মুখে কোনো অনুভূতি নেই। দুদিন বাদে বোম্বাইতে অপারেশন হলো। মুখে যন্ত্রণার কোনো ছাপ নেই।

কলকাতার প্রবীণ স্বয়ংসেবক ঘনশ্যাম দাস বেরিওয়ালার স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়, ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলে শ্রীগুরুজী কোনো উৎসব করতে বারণ করেছিলেন। কেননা দেশ খণ্ডিত হয়েছে। পাকিস্তানে হিন্দুদের হত্যা করা হচ্ছে, সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বললেন— এটা উৎসবের সময় নয়। দীনদয়ালজীর মৃত্যুতে শ্রীগুরুজী অঝোরে কেঁদেছিলেন। বলেছিলেন, 'একটা যুবক ছেলে অকালে চলে গেল।'

রাধাগোবিন্দ পোদ্দার বলেছেন, তিনি তখন হুগলী জেলা প্রচারক। শ্রীগুরুজী শ্রীরামপুরের ওপর দিয়ে বর্ধমান যাচ্ছেন। শুনেই তিনি ফ্লাস্কে গরম চা বিস্কুট নিয়ে স্টেশন হাজির। শ্রীগুরুজী ট্রেনের দরজায় এসে বলেন, জেলায় কতগুলি শাখা চলছে? গোবিন্দদা জানালেন, তেইশটি। শ্রীগুরুজী বললেন, 'keep it running'। এতে গোবিন্দদা উদ্বুদ্ধ হলেন। কেননা শাখার বিস্তার ঘটলেও দৃঢ়ীকরণ হচ্ছিল না। এবার তিনি দৃঢ়ীকরণে জোর দিলেন।

১৯৭০ সাল নাগাদ শ্রীগুরুজী শিলিগুড়ি থেকে দমদম বিমানবন্দর হয়ে বোম্বাই যাবেন। কাস্টমস্ অফিসার শ্রীগুরুজীকে প্রশ্ন করলেন, আপনার ওই কমণ্ডলুতে কী আছে? গুরুজী বললেন, 'আরে আপনি হিন্দুস্থানের অফিসার না বাইরের?' বলেই কমণ্ডলু থেকে জল ঢাললেন। অফিসার হাত পেতে জল নিয়ে কিছুটা মুখে দিয়ে বাকিটা মাথায় দিয়েই দৌড়। তাঁর কমণ্ডলুতে ভারতের সব নদীর জল থাকতো। তা দিয়ে শ্রীগুরুজী প্রতি সন্ধ্যা আহ্নিক করতেন। এই কমণ্ডলুটি তাঁকে তাঁর গুরু স্বামী অখণ্ডানন্দজী দান করেছিলেন।

১৯৭২ সালে কলকাতার মহম্মদ আলি পার্ক প্রভাত শাখায় শ্রীগুরুজী এসেছেন। এক বালক স্বয়ংসেবক তাঁকে বলছে, আপনাকে আরও ভালো স্বাস্থ্য করতে হবে। আপনি ভালো-মন্দ খাবেন। শ্রীগুরুজী বললেন, 'আমার তো খাবার কোনো অভাব নেই। ১০-১২টি বাটি আমার থালার চতুর্দিকে। তবে যতক্ষণ মানুষ রেলের প্লাটফর্মে রাত কাটাবে, গ্রামেগঞ্জে মানুষেরা এক বেলা খেয়ে দিন যাপন করবে, ততদিন আমার মুখে অন্ন রুচবে না।' এই হলো মানবপ্রেমিক শ্রীগুরুজী।

১৯৫৪ সালে শ্রীগুরুজী প্রথমবার শিলিগুড়িতে আসেন। কার্যক্রমের পর এনজেপি স্টেশনে কলকাতাগামী দার্জিলিং মেল ধরতে অপেক্ষমান। কয়েকজন স্বয়ংসেবক শ্রীগুরুজীকে প্রশ্ন করল, আপনি কতক্ষণ ঘুমান? তিনি হাতের একটি তালুর ওপর অন্য হাত রেখে হাসিমুখে বললেন— দিনে এক দু'-ঘণ্টা ঘুমালেই আমার পর্যাপ্ত বিশ্রাম হয়ে যয়ে। কত সহজ সরল কথা।

১৯৭৩ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে শ্রীগুরুজী পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন। এটাই ছিল তাঁর শেষ আসা। মেদিনীপুরে বিভাগের স্বয়ংসেবকদের সম্মেলনে বৌদ্ধিক দিতে গিয়ে সামনে ঝুঁকে সিঁড়িতে হাত রেখে মঞ্চে বসেন। এই সময় তাঁর অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল। অথচ তা তিনি কাউকে বুঝতে দেননি। বৌদ্ধিক শেষ করেই মঞ্চ থেকে নামেন।

শ্রীগুরুজীর শিক্ষা ছিল— নিঃস্বার্থ ভালোবাসাই সঙ্ঘকাজের চাবিকাঠি। সমাজের সর্বত্র কাজ করতে হবে। সঙ্ঘকাজে সময় দিতে হবে। সবাইকে নিয়ে চলাই আমাদের কাজ। সে সময়ের স্বয়ংসেবকরা সত্যিই ভাগ্যবান যাঁরা শ্রীগুরুজীর দর্শন এবং পথনির্দেশ লাভ করেছেন। শ্রীগুরুজীর প্রবাসে সমৃদ্ধ হয়েছে এখানকার স্বয়ংসেবক থেকে সঙ্ঘকাজ। আজও তাঁর চিন্তা, দর্শন ও আদর্শকে পাথেয় করে স্বয়ংসেবকরা সঙ্ঘকাজ করে চলেছেন।

সঙ্ঘ শতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গে স্বয়ংসেবকদের পক্ষ থেকে সর্বত্যাগী, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, ঋষি প্রতিম শ্রীগুরুজীর চরণে জানাই শত কোটি প্রণাম। □

টিংকু ও টুনি

—তুমি একটা দুষ্টু ছেলে। দিলে প্রজাপতিটাকে মেরে!

—আমি তো তোকে গুলতি

মেরেছি। আমাদের বাগানে ঢুকেছিস বলে। এখানে প্রজাপতি এল কোথা থেকে?

—আমার হাতে বসে ছিল প্রজাপতিটা। তুমি গুলতি মারতে আমি পড়ে গেলাম আর হাতের চাপে প্রজাপতিটা মরে গেল।

—তোর হাতে প্রজাপতি বসেছিল? মিথ্যুক কোথাকার। কারও হাতে প্রজাপতি বসে নাকি?

—আমার হাতে বসে, তুমি দেখবে?

—দেখাতো দেখি। আমার হাতে তো কোনোদিন বসে না।

—তুমি সরে দাঁড়াও।

—নে, এই আমি সরে দাঁড়ালাম। এবার দেখা দেখি।

টুনি বাগানের ভেতরে গেল। দু'হাত দিয়ে ফুলগুলোকে একবার আদর করে নিল। তারপর চোখ বুঁজে ডান হাতটা প্রসারিত করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

টিংকু দূর থেকে দেখতে থাকল। না, কোনো প্রজাপতি টুনির হাতে বসে নেই। ও মিথ্যে কথা বলেছে। এক পা দু'পা এগিয়েছে টিংকু। হঠাৎ চোখে পড়ল দুটো প্রজাপতি টুনিকে ঘিরে উড়ছে। এক সময় দুটোই টুনির হাতে বসল। দৃশ্যটা সত্যিই তাকে চমকে দিয়েছে।

(২)

—কী, দেখলে তো? টুনি আত্মবিশ্বাসী গলায় বলল।

—কিন্তু আমার হাতে কেন বসে না?

—তুমি যে গুলতি দিয়ে পাখি মারো। তুমি নিষ্ঠুর, তাই ওরা বসে না তোমার হাতে।

—আমি ভালোবাসলে বসবে?

—হ্যাঁ, বসবে বই কী?

(৩)

পরের দিন সকালবেলা ঘুম ভাঙলে টিংকু বাগানে চলে আসে। টুনির মতো ফুলগুলিকে হাত বুলিয়ে আদর করে। তারপর টুনির মতো ডান হাতটি বাড়িয়ে চোখ বুঁজে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অনেক ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও তার হাতে কোনো প্রজাপতি বসে না। তবু ধৈর্য না হারিয়ে টিংকু দাঁড়িয়ে থাকে। এক সময় হাতের তালুতে সুড়সুড়ি অনুভব করে। চোখ খুলে অবাক হয়ে যায় টিংকু। শুধু হাতের তালুতে নয়, তার সারা শরীর জুড়ে অসংখ্য প্রজাপতি বসে আছে। দূর থেকে দেখলে কেউ টিংকুকে খুঁজে পাবে না।

টুনি ঠিকই বলেছে, ভালোবাসলে প্রজাপতি হাতে এসে বসে। খুব ধীরে ধীরে টিংকু পকেট থেকে গুলতিটা বের করে দূরে ফেলে দিল।

দেবদাস কুণ্ডু

জাতীয় উদ্যান

আন্নমালাই

আন্নমালাই ন্যাশনাল পার্ক যা বর্তমানে আন্নামালাই টাইগার রিজার্ভ বা ইন্দিরা গান্ধী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য নামে পরিচিত। এটি তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোর জেলার পোলাচি ও ভালপারাই তালুকের আন্নামালাই পাহাড় এবং তিরুপুর জেলার উদুমালাইপেট্টাই তালুকে অবস্থিত। এর আয়তন ১৪৭৯.৮৭ বর্গকিলোমিটার। এখানে ৪০০০ প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে তার মধ্যে ৪০০ প্রজাতিই ঔষধিগুণসম্পন্ন। বন্য প্রাণীর রয়েছে বাঘ, হাতি, চিতাবাঘ, ঢোল, নীলগিরি তাহর, সিংহ, বন্য কুকুর, হরিণ প্রভৃতি। রয়েছে ২৫০ প্রজাতির পাখি। উভচর ও অনেক বিরল প্রজাতির সরীসৃপ রয়েছে। ৩১৫ রকমের প্রজাপতি রয়েছে। এই অভয়ারণ্যের সেরা প্রবেশদ্বার হসো টপস্লিপ। অন্যগুলি হলো অমরাবতী, সেথুমাদাই ও ভালপারাই।

এসো সংস্কৃত শিখি-৮৭

द्वितीया विभक्ति अ-कारान्त: स्त्रीलिङ्ग:

पत्रिका- पत्रिकाम् (পত্রিকা -- পত্রিকাকে)

स्थालिका- स्थालिकाम्।

माला- मालाम्।

अहं पत्रिकां स्वीकरोमि

अहं स्थालिकां स्वीकरोमि।

द्वितीया विभक्ति ई-कारान्त: स्त्रीलिङ्ग:

लेखनी- लेखनीम्। (কলম–কলমকে)

चलवाणी-चलवाणीम्

कर्तरी- कर्तरीम्।

कूपी-कूपीम्।

अहं चलवाणीम् स्वीकरोमि

अहं कूपीं स्वीकरोमि।

ভালো কথা

কালীপূজায় পটকা

এবার কালীপূজার রাতে আমরা ভাই-বোনেরা মিলে খুব পটকা ফাটিয়েছি। জেঠু রাস্তায় ফাটাতে নিষেধ করলেন। বললেন, বাড়ির পেছনে গিয়ে ফাটাতে। আমরা ওখানে অনেক রকমের বাজি ফাটালাম। আমাদের পাড়ার সোনু, রামু, শিউলি, প্রীতমও এসেছিল। খুব আনন্দ হয়েছিল। পরদিন সন্ধ্যায় যখন আমি আর ভাই পড়তে বসেছি তখন জেঠু এসে বললেন, দেওয়ালে তাকিয়ে দেখ একটাও মশা নেই। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম তাই তো! জেঠু বললেন, বাজি ফাটালে সেই শব্দে মশা সঙ্গে সঙ্গে হার্টফেল করে মরে যায়। পটকার মধ্যে গন্ধক থাকে, বাজি ফাটালে সেই গন্ধকের ধোঁয়ায় মশা মরে যায়। তাছাড়া কালীপূজার সময় অনেক পোকামাকড় আসে, সেগুলোও পটকা ফাটালে মরে যায়। সেজন্য কালীপূজায় নানা রকম বাজি ফাটানোর নিয়ম।

সায়ন্তন ভৌমিক, ষষ্ঠশ্রেণী, চাকদহ নদীয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) প্রে দে ক মি

(২) র ম ন্দি দে

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) র ড় ম ম কা ণ

(২) ত ত লি লি পা লা

১৫ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) হিমশীতল (২) সুরসাধনা

১৫ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) হাজারদুয়ারি (২) সিংহশাবক

(১) শিবম রায়, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা। (২) বর্ণিনী সরকার, বিএস রোড, মালদা। (৩) মানসী সরকার, বৈষ্ণবনগর, মালদা। (৪) শুভম্ রায়, ধুপগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT ☎ 8240685206 9748978406
Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com
NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

সঙ্ঘ এক গভীর অনুধ্যানের বিষয়

ধর্মানন্দ দেব

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নাম আজ সর্বজনবিদিত। কোনো সামাজিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক ঘটনা ঘটলে তার সঙ্গে সঙ্ঘ বা সঙ্ঘ অনুপ্রাণিত সংগঠনগুলিকে যুক্ত করা যেন এক রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে একশ্রেণীর লেখক ও বুদ্ধিজীবীর ক্ষেত্রে এ প্রবণতা প্রকট। তাঁদের অনেকের লেখনি দেখে মনে হয় যেন দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে তাঁদের চূড়ান্ত জ্ঞান রয়েছে। তাঁরা সঙ্ঘ সম্পর্কে মনে মনে একটি পূর্বধারণা তৈরি করে নেন এবং সেটিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নানা তথাকথিত প্রমাণ হাজির করেন, যা অধিকাংশ সময়েই কল্পনাপ্রসূত বা একপেশে ব্যাখ্যা হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু সঙ্ঘকে বোঝার জন্য আংশিক তথ্য নয়, দরকার তার সম্পূর্ণ রূপে জানা। সঙ্ঘ কেবল একটি সংগঠন নয়— এটি এক জীবন্ত প্রক্রিয়া, এক সৃষ্টিশীল আন্দোলন যা মানুষের ভেতরে শক্তি, শৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলে। সঙ্ঘের মূল লক্ষ্য হলো মানুষ গঠন— মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ সাধন। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার বলেছিলেন, 'সঙ্ঘের উদ্দেশ্য এমন মানুষ তৈরি করা যারা সমাজের প্রায় বিলুপ্ত গুণগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করবে এবং জাতিকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।' তাঁর কথায় স্পষ্ট যে সঙ্ঘের উদ্দেশ্য কেবল সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক পুনর্জাগরণ।

সঙ্ঘের মূল কার্যক্রম হলো 'শাখা'। শাখা কেবল শারীরিক কসরত বা খেলাধুলার জায়গা নয়— এটি স্বয়ংসেবকের জন্মস্থান, কর্মস্থান ও মর্মস্থান। প্রতিদিন সকালে বা সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট মাঠে স্বয়ংসেবকরা সমবেত হন। গৈরিক পতাকার সামনে শরীরচর্চা, কুচকাওয়াজ, দলগত খেলা, বৌদ্ধিক আলোচনা চলে। এর মাধ্যমে গড়ে ওঠে শৃঙ্খলা, সাহস, নেতৃত্ব, সহমর্মিতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের গুণ। প্রার্থনায় দেশকে মাতৃ রূপে কল্পনা করে প্রতিজ্ঞা করা হয়— 'তব শক্তিরূপে মম শিরসে বিরাজতু'— অর্থাৎ মাতৃভূমির শক্তি যেন আমার মধ্যে বিরাজ করে।

দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী সঙ্ঘকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন এভাবে : 'সঙ্ঘ একটি মেশিন নয়, এটি একটি জীবন্ত অর্গানিজম। এখানে প্রতিটি স্বয়ংসেবক হলো একেকটি কোষ, যে তার ব্যক্তিগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জাতির উন্নতিতে অবদান রাখে।' তাঁর কথায় সঙ্ঘের জীবন্ত রূপ ফুটে ওঠে— এটি কেবল কাঠামো নয়, এক চলমান রাষ্ট্রীয় সাধনা। সঙ্ঘের কাজের ক্ষেত্র বহুবিস্তৃত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ উন্নয়ন, সামাজিক সমরসতা থেকে শুরু করে দুর্যোগকালে ত্রাণকার্য— স্বয়ংসেবকরা সর্বত্র সক্রিয়। ১৯৪৭-এর বিভাজনের সময় শরণার্থীদের সাহায্য, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশি উদ্বাস্তুদের ত্রাণ, ভূমিকম্প, বন্যা, সাইক্লোনে ত্রাণসেবা— এসব ক্ষেত্রে স্বয়ংসেবকদের নিরলস ভূমিকা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ।

স্বয়ংসেবকদের একটি বড়ো অবদান হলো শিক্ষা ক্ষেত্রে। বিদ্যা ভারতী পরিচালিত হাজার হাজার বিদ্যালয়ে আজ লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছে। এই বিদ্যালয়গুলোতে শুধু পাঠ্যবই নয়, চরিত্রগঠন, দেশপ্রেম, পরিবেশ সচেতনতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ শেখানো হয়। এক কথায় সঙ্ঘ শিক্ষাকে এক নৈতিক যাত্রায় রূপান্তর করেছে।

সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে মূল স্রোতে আনার জন্য স্বয়ংসেবকেরা পরিচালনা করছেন একাধিক সেবা প্রকল্প। দলিত ও জনজাতি এলাকায় 'একাত্মতা যজ্ঞ' চালু করে সামাজিক সমতা গড়ে তোলা, স্বাস্থ্য শিবির, রক্তদান শিবির আয়োজন, গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প, গোরক্ষা আন্দোলন, পরিবেশ সংরক্ষণ অভিযান— সবই স্বয়ংসেবকদের কর্মধারার অংশ।

সমালোচকরা প্রায়ই অভিযোগ তোলেন যে সঙ্ঘ হিন্দুদের সংগঠিত করার নাম করে বিভাজন সৃষ্টি করে। কিন্তু বাস্তবে সঙ্ঘের উদ্দেশ্য সমাজকে বিভক্ত করা নয়, বরং ভগ্ন সমাজকে একত্রীকরণ। সঙ্ঘের ভাষায় 'হিন্দু' শব্দটি কোনো সংকীর্ণ ধর্মীয় পরিচয় নয়, বরং ভারতীয় সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতীক। শ্রীগুরুজী বলেছিলেন, 'হিন্দু শব্দটি এমন এক সাংস্কৃতিক ছাতা যার নীচে ভারতের সব সম্প্রদায়, ভাষা, জাতি ও সম্প্রদায় আশ্রয় নিতে পারে।'

এখানে একটি গল্প প্রাসঙ্গিক— গ্রামে একটি হাতি এলো, সেটিকে বুঝতে সাত-আট জন অন্ধমানুষ একত্রিত হলেন। প্রত্যেকে হাতির আলাদা অঙ্গ স্পর্শ করে আলাদা আলাদা বর্ণনা দিলেন। অবশেষে তারা বিতণ্ডায় জড়ালেন। সঙ্ঘ-বিরোধীদের মতামতও অনেকটা তেমন— আংশিক তথ্য ধরে চূড়ান্ত মন্তব্য। সঙ্ঘকে বোঝার জন্য তার পূর্ণরূপ দেখা দরকার। শাখায় গিয়ে দেখা, স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে সময় কাটানো— তখনই বোঝা যায় যে সঙ্ঘ আসলে এক চলমান বিশ্ববিদ্যালয়।

সঙ্ঘ আজ তার রাষ্ট্রসেবার শতবর্ষ পূর্ণ করেছে। শতবর্ষের যাত্রায় সঙ্ঘ বহু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে— ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন, স্বাধীনতার পর বিভাজনজনিত জেহাদি আক্রমণ, জরুরি অবস্থার কালো অধ্যায়— সব ক্ষেত্রেই স্বয়ংসেবকরা তাদের নীতি ও আদর্শ অবিচল থেকেছে। ডাঃ হেডগেওয়ারের ভাষায়, 'আমরা রাজনীতির জন্য নয়, জাতির পুনর্গঠনের জন্য কাজ করছি।'

সঙ্ঘের আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ সঙ্গে যুক্ত— নিজের মুক্তির জন্য নয়, সমাজের কল্যাণের জন্য কর্ম করো। এই কর্মযোগই সঙ্ঘের সাধনা। তাই সঙ্ঘকে কেবল বই পড়ে জানা যায় না— তার প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করতে হয় শাখায় গিয়ে, প্রার্থনায় অংশ নিয়ে, স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে কাজ করে। তখনই বোঝা যাবে যে সঙ্ঘ আসলে এক চলমান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়— যেখানে প্রতিদিন শেখানো হয় শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম, ভ্রাতৃত্ব, আত্মসংযম ও কর্মযোগ।

অতএব, সঙ্ঘ কী— তার উত্তর এক বাক্যে হলো : সঙ্ঘ মানুষের মধ্যে লুকানো সম্ভাবনাকে জাগ্রত করার এক পবিত্র প্রচেষ্টা। এটি একটি সাংস্কৃতিক নবজাগরণ, চরিত্রবান মানুষ তৈরির মহাযজ্ঞ, এক মহান জাতীয় সাধনা।

(লেখক পেশায় আইনজীবী)

ফ ঃ ৬

বন্দে মাতরম্ মন্ত্র দেশবাসীর হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়ে ছিল

অমিত কুমার চৌধুরী

কয়েকটি ধ্বনি আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে আজও দেশবাসী অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও উৎসাহের সঙ্গে দিয়ে থাকেন তার মধ্যে একটি হলো বন্দেমাতরম। বন্দেমাতরম ধ্বনির প্রভাব সবচেয়ে বেশি বলে মনে হয়। এই মন্ত্র কানে গেলে ব্রিটিশ সরকার ভীত হয়ে পড়তো, যা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এক অমোঘ অস্ত্র ছিল ভারতবাসীর। অপরদিকে ভারতবাসীর মধ্যে এক অসাধারণ উন্মাদনা তৈরি করত। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিশেষ করে বিপ্লবীদের কাছে এটি এক দেশপ্রেমের মহামন্ত্র হয়ে উঠেছিল। এই গানটি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী প্রতীক হয়ে উঠেছিল। তার জন্য ব্রিটিশ সরকার একে নিষিদ্ধ করেছিল। বন্দেমাতরম মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে ভারতমাতার শত শত বীর সন্তান হাসিমুখে দেশমাতৃকার বেদীমূলে নিজেদের জীবন সমর্পণ করেছিলেন। ফাঁসির দড়িকে চুম্বন করে দেশমাতৃকাকে বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত করেছিলেন নিঃস্বার্থ ভাবে, নির্ভীক ভাবে। সেই বন্দেমাতরম মন্ত্রের এই বছর ১৫০ বছর পূর্তি।

সাহিত্যিসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৫ সালে হুগলী জেলার চুঁচুড়াতে গঙ্গা নদীর কাছে জোড়াঘাটে আঢ্য পরিবারের একটি সাদা রঙের বাড়িতে প্রথম বন্দেমাতরম গানটি রচনা করেন। পরবর্তীতে ১৮৮২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র তার সেই বিখ্যাত উপন্যাস আনন্দমঠ প্রকাশ করে তার মধ্যেই বন্দেমাতরম গানটি অন্তর্ভুক্ত করেন। এই আনন্দমঠ উপন্যাসই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রেরণার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। আর বন্দেমাতরম গানটি হয়ে উঠে বিপ্লবীদের সঞ্জীবনী মন্ত্র। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র। দেশমাতা অতীতে কেমন ছিলেন, বর্তমানে কেমন হয়েছেন ও ভবিষ্যতে কেমন হবেন তা দেখিয়েছেন।

যদুনাথ ভট্টাচার্য এই গানের সুর দিয়েছিলেন। ১৮৯৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার বিডন স্কোয়ারে কংগ্রেসের অধিবেশনে বন্দেমাতরম গানটি গেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ গানটি 'দেশ' রাগে প্রকাশ করেন যা বঙ্কিমচন্দ্রেরও প্রিয় ছিল। ১৯০৫ সালে বেনারস কংগ্রেস অধিবেশনে সরলাদেবী চৌধুরাণী গানটি পুনরায় গেয়েছিলেন।

১৯০৫ সালে হীরালাল সেন প্রথম রাজনৈতিক ছবিতে বন্দেমাতরম গান দিয়ে শেষ করেছিলেন। আনন্দমঠ, লিডার ও অমরআশা সিনেমায় গানটি গাওয়া হয়েছে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত রবিশঙ্করও গানটি নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। লতা মঙ্গেস্কর ছাড়াও বহু প্রখ্যাত শিল্পী তাঁদের সুললিত কণ্ঠে গানটি গেয়েছেন। ১৯০৬ সালে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গানটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। ভারতের সব মুখ্য ভাষাতে গানটি অনুবাদ করা হয়েছে। আরিফ মহম্মদ খান তিনিও বন্দেমাতরম গানটি উর্দু ভাষাতে অনুবাদ করেছেন। ২০০২ সালে BBC World Service-এর এক সমীক্ষায় বন্দেমাতরম গানটি বিশ্বে ৭০০০ গানের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে।

১৯০৭ সালে ভিকাজী কামার তৈরি জার্মানিতে ত্রিরঙা জাতীয় পতাকার মাঝখানে বন্দেমাতরম লেখা ছিল। লালা লাজপত রায় লাহোরে বন্দেমাতরম নামে এক পত্রিকা শুরু করেছিলেন। ১৯০৫ সালে বিপিনচন্দ্র পাল ইংরেজি ভাষায় বন্দেমাতরম নামে পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ এই পত্রিকার সম্পাদনা করতেন ও কঠোর ভাবে ইংরেজ শাসনের সমালোচনা করতেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে দেশবাসীকে তিনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতেন।

বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা ব্রিটিশের গুলিতে প্রাণ ত্যাগের সময় বন্দেমাতরম ছিল তাঁর শেষ কথা। ১৯০৭ সালে বরিশালে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ডিএইচ কিংসফোর্ড বন্দেমাতরম বলে প্রতিবাদ করায় ১৫ বছরের কিশোর সুশীল সেনকে ১৫ ঘা বেত্রাঘাত করার সময় সুশীল সেন প্রতিটি চাবুকের উত্তর বন্দেমাতরম বলেই দিয়েছিলেন। তবুও তাঁর মুখ থেকে বন্দেমাতরম বন্ধ করতে পারেনি। এমনই ছিল সেই মন্ত্রের শক্তি। এই রকম শত শত বিপ্লবী বন্দেমাতরম মন্ত্র উচ্চারণ করে বীরের মৃত্যু বরণ করেন। ব্রিটিশ আমলে এই নিষিদ্ধ বন্দেমাতরম ধ্বনি উচ্চারণের জন্য সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার হেডগেওয়ার তাঁর বাল্যকালে নাগপুরের নিজ স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন।

১৯৩৭ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রথম বন্দেমাতরম গানটির প্রথম দুটি স্তবক জাতীয় সংগীত হিসেবে ঘোষণা করে। গান্ধীজী, মৌলানা আজাদ, জওহরলাল নেহরু, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুমোদন দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মুসলিম লিগ এবং মহম্মদ আলি জিন্না এই গানের বিরোধিতা করেন ইসলামের দোহাই দিয়ে। কাকিনাড়া কংগ্রেস অধিবেশনে এই গান গাওয়ার বিরোধিতা করেছিলেন মহম্মদ আলি ও শওকত আলি। যে গান কোটি কোটি মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করছে, দেশের জন্য নির্ভীক ভাবে আকাতরে প্রাণ দিয়েছে অথচ কিছু মানুষ তার বিরোধিতা করলো। যারা করেছিল তারাই এই দেশকে অপবিত্র ভূমি বলে ভারত ভাগ করেছেন। দেশকে টুকরো করেছিল। স্বাধীনতার এতো বছর পরও আজও তারা নেতা বন্দেমাতরম গাইতে অস্বীকার করে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর মৃত্যুশয্যায় তাঁর মেয়েকে 'বন্দেমাতরম' গান সম্পর্কে বলেছিলেন— 'দেখবি এই সংগীত একদিন ভারতবাসীর অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে দিবে।' অর্থাৎ তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিলেন, তাঁর রচিত এই গান ভবিষ্যতে ভারতীয়দের মধ্যে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার চেতনা ছড়িয়ে দেবে এবং তা হয়েছিল। বন্দেমাতরম গানের ১৫০ বছর পূর্তিতে সেই মহান সংগীতের রচয়িতা দ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে জানাই শত শত প্রণাম। □

ষষ্ঠ তফশিলের অধীনে লাদাখের অন্তর্ভুক্তিতে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে

অরুণ কুমার চক্রবর্তী

'সিক্সথ্ শিডিউল' বা ষষ্ঠ তফশিল হলো ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্গত একটি বিষয় যেটি কোনো অঞ্চলে কার্যকর হলে, বা কোনো অঞ্চল সংবিধানের এই তফশিলের অধীনে এলে সেখানে 'অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল' বা স্বয়ংশাসিত জেলা পরিষদ গঠিত হয়। এই কাউন্সিলগুলিকে ভূমি, বনাঞ্চল, গ্রাম, স্থানীয় প্রশাসন, পরম্পরাগত আইন-কানুন, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে আইন প্রণয়ন এবং প্রশাসন পরিচালনার ক্ষমতা দেওয়া হয়। সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলের আওতায় এমন একটি স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব যার দ্বারা কোনো অঞ্চলে স্থানীয় স্তরে ভূমির ব্যবহার, পরিবেশ রক্ষা করে বিভিন্ন প্রকল্পের অনুমোদন ইত্যাদি বিষয়গুলি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখকে যদি সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলের অধীনে নিয়ে আসা হয়, তবে আগামীদিনে নানা সমস্যা সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে স্থানীয় কাউন্সিল বিভিন্ন পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে নানা নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী হয়ে উঠতে পারে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা অভিমুখে নির্মীয়মাণ সড়ক ইত্যাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে তারা তাদের মতো 'সিদ্ধান্ত' নেওয়ার দাবিও তুলতে পারে। ভৌগোলিক অবস্থান এবং অঞ্চলটি চীন ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী হওয়ার কারণে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা এবং ভু-রাজনৈতিক দিক থেকে 'লাদাখ' হলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক অধিকার খর্ব হয়ে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা হলে এবং ভবিষ্যতে সেই স্বায়ত্তশাসনের অপব্যবহার শুরু হলে, বা গুরুত্বপূর্ণ রুটগুলিতে সড়ক নির্মাণ বাধাপ্রাপ্ত হলে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে।

তবে সীমান্ত ও প্রতিরক্ষা কেন্দ্রের বিষয়। সংবিধানের 'সেভেনথ্ শিডিউল' বা সপ্তম তফশিলে বর্ণিত 'ইউনিয়ন লিস্ট'-এর প্রথম বিষয়ই হলো ভারতীয় প্রতিরক্ষা। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পরিকাঠামো নির্মাণ, সশস্ত্র বাহিনী এবং প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত যাবতীয় অধিকারের ক্ষমতা সংবিধানবলে কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত। প্রতিরক্ষা ও সীমান্ত রক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো (সড়ক, সেতু, যোগাযোগ ব্যবস্থা) কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে পারে। তাই কোনো স্থানীয় বিধি যদি সামরিক পরিকাঠামো নির্মাণ বা সেনাবাহিনীর যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি করে, তবে তা মেনে না নেওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের কাছে শক্তিশালী সাংবিধানিক যুক্তি রয়েছে।

২০১৯-এ সংসদে প্রণীত 'জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর রিঅর্গানাইজেশন অ্যাক্ট' অনুযায়ী লাদাখকে একটি বিধানসভাহীন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়েছে। লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটি ভারতের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত 'লেফটেন্যান্ট গভর্নর' বা উপ-রাজ্যপাল কর্তৃক শাসিত। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের এই প্রশাসনিক কাঠামোটি ভু-রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ লাদাখের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সহায়ক ও উপযুক্ত। ভারতীয় সংবিধানের ২৩৯ ও ২৪০ নং অনুচ্ছেদ সূত্রে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের এই প্রশাসনিক কাঠামোটি এই অঞ্চলের বিষয়ে কেন্দ্রকে আইন প্রণয়ন এবং সেই আইন প্রয়োগের ক্ষমতাও প্রদান করে।

সম্প্রতি ষষ্ঠ তফশিলের অধীনে অন্তর্ভুক্তির দাবিতে উত্তপ্ত হয়েছে লাদাখ। এমনকী সংবিধানের বাতিল হওয়া ৩৭০ ধারা আবার ফিরিয়ে আনার দাবিও তুলেছে বিক্ষোভকারীদের একাংশ। এই ধরনের বিক্ষোভ সৃষ্টির পিছনে কাদের মদত রয়েছে তা জানে দেশবাসী। প্রশ্ন হলো, এই বিষয়ে ভারত সরকার আগামীদিনে কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে? এই সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রে কেন্দ্র নিতে পারে আইনি ব্যাকআপ এবং সংসদে আইন প্রণয়নের রাস্তা। কেন্দ্র ইতিমধ্যেই জানিয়েছে যে সীমান্ত পরিকাঠামো কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়। জাতীয় স্বার্থে সংসদে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সড়কপথগুলিকে 'স্ট্র্যাটেজিক বা ডিফেন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার' বলে ঘোষণা করতে পারে কেন্দ্র। ফলে স্থানীয় স্তরে বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনের অপব্যবহারের প্রচেষ্টা বিশেষ কার্যকরী হবে না। আদালতে মামলা হলেও প্রতিরক্ষা বিষয়ক আইনি যুক্তি সেখানে তুলে ধরতে পারে কেন্দ্র। সংবিধানের ২৩৯ ও ২৪০ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রশাসনিক বিধি প্রয়োগও সম্ভব। এক্ষেত্রে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের ক্ষেত্রে উপ-রাজ্যপালের মাধ্যমে 'রেগুলেশন' জারি করা হতে পারে। ২৪০ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রয়োজন দেখা মাত্রই 'পিস, প্রোগ্রেস অ্যানচ গুড গভর্ন্যান্স' বা শান্তি, উন্নয়ন এবং সুশাসন অব্যাহত রাখতে ভারতের রাষ্ট্রপতি বিশেষ নিয়ম তৈরি করতে পারেন। ২০১৯ সালে প্রণীত আইনটিতেও এই ধারাগুলির নির্দিষ্ট উল্লেখ রয়েছে। আগামীদিনে যদি স্থানীয় কাউন্সিল গঠিত হয় এবং সেই কাউন্সিলের কোনো সিদ্ধান্ত যদি সীমান্ত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো বিপদ সৃষ্টি করে, তবে কেন্দ্র প্রশাসনিকভাবে ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক কোনো রুটকে 'স্ট্র্যাটেজিক' আখ্যা দিচ্ছে মানেই জাতীয় নিরাপত্তার কারণেই সেখানকার পরিকাঠামো নির্মাণ-সহ যাবতীয় প্রশাসনিক কাজ অগ্রাধিকার পাবে। এই ক্ষেত্রে স্থানীয় কাউন্সিলের অনুমতি গ্রহণের বিষয়গুলি গৌণ হয়ে পড়ে। জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো আপোশ কাম্য নয়ও। এই ধরনের কাজে যুক্ত থাকে ভারতীয় সেনা। স্থানীয় বাধা কাটিয়ে সেনাবাহিনীর 'ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পস্' দ্রুত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারে। 'প্রতিরক্ষা' কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয় হওয়ার কারণে সাংবিধানিক ক্ষমতার প্রয়োগ এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় কাউন্সিল যদি আদালতে মামলা করে, সেই ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থরক্ষা এবং কেন্দ্রীয় তালিকা থেকে প্রাপ্ত অধিকার রক্ষার যুক্তি আদালতে দাখিল করবে ভারত সরকার। অতীতে এ ধরনের বিভিন্ন মামলার ক্ষেত্রে জাতীয় নিরাপত্তার ইস্যুতে কেন্দ্রের অবস্থানই বিভিন্ন আদালতে প্রাধান্য পেয়েছে। এই কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের এই আইনি কৌশল বিশেষভাবে কার্যকরী হবে। প্রাক-অপারেশনাল প্রস্তুতি এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় সক্রিয়তা বজায় রাখতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বা সেনাবাহিনীও পরিকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত নানারকম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে, যেমন— হেলিকপ্টার-ভিত্তিক সাপ্লাইলাইন, অল্টারনেট রুট বা বিকল্প রাস্তা, র‍্যাপিড বেয়ারিং ব্রিজ ইত্যাদি। কেন্দ্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রক লাদাখের গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথগুলিকে 'রিজার্ভ ওয়ে'-এর স্বীকৃতি দিতে পারে। সেক্ষেত্রে এই সড়কগুলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের যানবাহন চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে।

আগামী পনেরো বছরে একশো বিলিয়ন ডলারের লগ্নি দেশে দশ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে

পীযূষ গোয়েল

শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে এই প্রতিবেদকের অভিমত হলো--- সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, আইসল্যান্ড এবং লিস্টেনস্টাইনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চুক্তি আগামী দিনে দেশের অর্থনীতির গেম চেঞ্জার রূপে গণ্য হবে। এই বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় উন্নত ভারতের লক্ষ্যে আরেকটি দ্বার উন্মুক্ত হলো। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে পশ্চিমি ব্লকের দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করলো ভারত। এমন কয়েকটি দেশের সঙ্গে এই চুক্তি হয় যাদের মাথাপিছু বার্ষিক আয় এক লক্ষ ডলারের ওপর এবং এই চুক্তির মাধ্যমে ভারতীয় কৃষক, মৎস্যজীবী এবং এমএসএমই-গুলির জন্য আগামীদিনে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবারিত দ্বার খুলে যাবে। বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার লক্ষ্যে এই চুক্তি ঐতিহাসিকভাবে স্বাক্ষরিত হলো সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, আইসল্যান্ড ও লিস্টেনস্টাইনের মতো মুক্ত বাণিজ্যপন্থী ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে। গত ১ অক্টোবর থেকে এই ঐতিহাসিক চুক্তি কার্যকর হয়েছে। এই ইএফটিএ ('ইউরোপিয়ান ফ্রী ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন' গোষ্ঠীভুক্ত) দেশগুলো আগামী পনেরো বছরে ভারতে একশো বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের জন্য চুক্তিবদ্ধ। এই বিনিয়োগ প্রধানমন্ত্রীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' স্লোগানকে কার্যকর করার পক্ষে সহায়ক হবে।

ভারত সরকার অতীতের সমস্ত ইতস্তভাবকে বিসর্জন দিয়ে মুক্ত বাণিজ্যকে স্বাগত জানিয়ে ভারতের তৈরি দ্রব্য-সামগ্রী ও বিভিন্ন পরিষেবা বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলিতে রপ্তানি করবে। এই চুক্তি কেবলমাত্র অসংখ্য সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেবে না, এর মাধ্যমে দেশের শিল্প সমৃদ্ধ হবে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং ভারতীয় শিল্পগুলি আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে সক্ষম হবে। এ বছর জুলাইয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত হওয়ার লক্ষ্যে কথাবার্তা চলছে। এর আগে প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া ও ইউএই-এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্যে ভারতীয় শিল্প তার অবস্থান ও ছায়া প্রলম্বিত করেছে। মোদীজীর প্রধানমন্ত্রিত্বে বিভিন্ন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিটি এফটিএ (ফ্রী ট্রেড এগ্রিমেন্ট) সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, অথচ পূর্বের ইউপিএ জমানায় আন্তর্জাতিক স্তরে এ ধরনের দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির ক্ষেত্রে তড়িঘড়ি করে সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রবণতা ছিল। সেই আমলে চুক্তি সম্পাদনের প্রক্রিয়ায় সব পক্ষকে শামিল করা হয়নি এবং কোনো ইনপুট ছাড়াই প্রতিযোগী অর্থনীতি ভারতের বাজারে প্রবেশ করলেও, ভারতীয় শিল্পগুলির জন্য তাদের বাজার তারা উন্মুক্ত করেনি।

ইউপিএ জমানায় উচ্চ কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিটের কারণে বিশ্বের মধ্যে 'ফ্র্যাজাইল ফাইভ' বা পাঁচটি ভঙ্গুর অর্থনীতির অন্যতম হয়ে ওঠে ভারত। ব্রাজিল, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক ও দক্ষিণ আফ্রিকা ছিল এই ফ্র্যাজাইল ফাইভ। গত এগারো বছরে বিভিন্ন আর্থিক সংস্কারের মাধ্যমে 'ভঙ্গুর পাঁচ' থেকে ভারতীয় অর্থনীতিকে উদ্ধার করেছে প্রধানমন্ত্রী মোদীজী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার। বিদেশি লগ্নিকারকদের জন্য ভারতীয় বাজারকে লগ্নির গন্তব্যস্থলে পরিণত করেছেন মোদীজী। তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকার একে একে সমাপ্ত করেছে শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অসুবিধা, যেমন নানা অনুমতিপ্রদানের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক স্থবিরতা, মুদ্রাস্ফীতির চড়া হার ও দুর্নীতি। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে বৃদ্ধি পেয়েছে বিভিন্ন সংস্থার যোগ্যমানান। এ বছর মার্চ পর্যন্ত 'প্রোডাকশন লিঙ্কড্ ইনসেন্টিভ' বা পিএলআই-এর মাধ্যমে ভারতে ১.৭৬ লক্ষ কোটি টাকার লগ্নি এসেছে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ১২ লক্ষ। সম্ভব হয়েছে সরকারি ব্যয় সংকোচন। 'ন্যাশনাল লজিস্টিক্স পলিসি' ও 'প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি' যোজনার মাধ্যমে মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে পরিকাঠামো উন্নয়ন। ভারতের ডিজিটাল পরিকাঠামো যেমন জনধন যোজনায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ইউপিআই ও 'ট্রেড কানেক্ট ই-প্ল্যাটফর্ম'-এর মাধ্যমে আর্থিক লেন-দেন বেড়েছে বহুগুণ।

আগামী ১৫ বছরের জন্য ইউরোপিয়ান ফ্রী ট্রেড এগ্রিমেন্টে প্রস্তাবিত ১০০ বিলিয়ন ডলারের লগ্নি ভারতের অর্থনীতিতে প্রবেশ করলে তাতে সরাসরি কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে দশ লক্ষ যুবক-যুবতীর। ইতিমধ্যেই অপ্রত্যক্ষ লগ্নি এসেছে ১১.৯ বিলিয়ন ডলারের এবং ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে লগ্নি এসেছে ৮১ বিলিয়ন ডলার যা বিগত আর্থিক বছরের তুলনায় ১৪ শতাংশ বেশি। এই লগ্নি আসার পিছনে রয়েছে ভারতের শক্তিশালী অর্থনৈতিক বুনিয়াদ।

নানা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি ছাড়াও বিভিন্ন শ্রমনিবিড় শিল্প যেমন টেক্সটাইলস্, জুয়েলারি ইত্যাদিতে আর্থিক লগ্নির ফলে কাজের দরজা খুলে যাবে যুবসমাজের সামনে। ইএফটিএ দেশগুলোর ধনী গোষ্ঠীর কাছে ভারতীয় কৃষিজাত পণ্য, চা, কফির চাহিদা বাড়বে। ভারতীয় কৃষিজাত ও দুগ্ধজাত পণ্যকে সুরক্ষিত রাখতে ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি চাল, ডাল, কাজুবাদাম, আঙুর, আম-সহ অন্যান্য ভেষজ সামগ্রীর রপ্তানির দরজা দরাজ হাতে খুলে দিয়েছে ভারত সরকার। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অবস্থান ধরে রাখতে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যসামগ্রী (প্রসেসড্ ফুডস্) যেমন চকোলেট, বিস্কুটের মতো সামগ্রীর রপ্তানি শুল্ক কমিয়েছে সরকার। মৎস্যজীবীরাও উল্লসিত কারণ ভারত সরকারের সহযোগিতায় তাঁদের উৎপাদিত ও সংরক্ষিত মৎস্য, চিংড়ি রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিদেশে পরিষেবা শিল্পের উন্নয়ন রকেট গতি প্রাপ্ত হয়েছে। নার্সিং, অ্যাকাউন্টেসি, আর্কিটেকচারের মতো পরিষেবা ক্ষেত্রে ভারতীয় পেশাদারদের জন্য সুযোগের দরজা খুলে গিয়েছে ইএফটিএ-র অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে। এছাড়া তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্র, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র, বিনোদন, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভারতীয়দের কদর বহুগুণ বেড়েছে।

শুল্ক-জনিত বাধা অতিক্রম এবং খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে, সাধারণ গ্রাহকদের স্বার্থরক্ষার জন্য উৎপাদনের গুণগত মানের ওপর কড়া নজরদারির মাধ্যমে শংসাপত্র প্রদানে সহায়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি হলো 'ট্রেড অ্যান্ড ইকোনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট'। এই শংসাপত্রের সাহায্যে ইএফটিএ-র অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোতে পণ্য, পরিষেবার মতো বাণিজ্যে ভারতের প্রবেশাধিকার মিলেছে। এর ফলে ভারতীয় কৃষক, উৎপাদকরা তাদের পণ্যের উৎকর্ষতা যেমন 'রপ্তানিযোগ্য' স্তরে উন্নীত করবে সেই সঙ্গে ঘরোয়া পণ্যের মানও বৃদ্ধি পাবে। এই ধরনের বাণিজ্য যেমন উৎপাদকদের উৎসাহিত করবে তেমনই সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলে। অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে ভারত। দেশবাসীর অভীষ্ট পূরণের লক্ষ্যে কখনো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে না এই নতুন ভারত। আজকের ১৪০ কোটি ভারতীয়কে একসঙ্গে, লক্ষ্যে স্থির থেকে, আত্মবিশ্বাসকে পাথেয় করে, বিশ্বের যাবতীয় চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে নিজেদেরকে আরও বেশি শিক্ষিত, দক্ষ ও শক্তিশালী করে তুলতে হবে। ডিজিটালাইজেশনের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়ে আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে দেশকে এগিয়ে যেতে হবে।

(লেখক ভারতের শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী)

আজ ধ্বংসের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ

অমলেশ মিশ্র

বিষয়টি বেশ গুরুতর। আমি এই বিষয়ের সম্পূর্ণ চিত্রন হয়তো করতে পারব না। তবে খোলা চোখে যতটুকু ধরা পড়েছে তা উল্লেখযোগ্য হলেও আদৌ আকর্ষণীয় নয়। মনঃপীড়া ঘটায়। আমার চাকুরির সময়কাল প্রায় ৩৮ বছর, ১৯৬০ থেকে ১৯৯৮। এই সময়কালেই পরিবর্তন চোখে পড়েছিল। ২০২৫ সালে এসে প্রায় ৬৫ বছরে সেই ছবি এখন বীভৎস! এই সময়ের মধ্যে প্রায় ১৭ বছর কংগ্রেসের, ৩৪ বছরে সিপিএম পরিচালিত বামফ্রন্টের এবং ১৫ বছর তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকাল। এই ৬৫ বছরের মধ্যে ধ্বংসাত্মক পরিবর্তনটা শুরু হয়েছিল বামফ্রন্টের সময়ে। বীভৎস রূপ ধারণ করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের সময়ে। রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে এ রাজ্যের পরিবেশ হয়েছে বিষাক্ত।

বামফ্রন্টের সময়কালে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের বেতন উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি পড়ানো নিষিদ্ধ হয়েছিল। আর শিক্ষার সঙ্গে যুক্তদের নিয়োগ হতো রাজনৈতিক রং দেখে। সিপিএম নেতা অনিল বিশ্বাসের নামের সঙ্গে মিল রেখে এই প্রক্রিয়ার নামকরণ হয় 'অনিলায়ন'। বামফ্রন্ট শাসনে বঙ্গীয় শিক্ষার অনিলায়ন হওয়ার পর তৃণমূল কংগ্রেসের সময়কালে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা পার্থেনিয়ামে আক্রান্ত হয়। সিপিএমের পদ্ধতি অনুসরণ করে রাজ্য শাসন অব্যাহত রাখেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী। এই সময়কালে শিক্ষাদপ্তরে দেখা দিয়েছে প্রবল দুর্বৃত্তায়ন।

বাঙ্গালির পরিবর্তন সর্বদাই শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত। কারণ প্রধানত শিক্ষাগ্রহণকালে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে মানবতার বীজ রোপণ ও ফলবতী বৃক্ষে রূপান্তরণ ঘটে। বঙ্গীয় শিক্ষা জগতে আধুনিক শিক্ষার ধারা প্রবর্তন করেছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। শিক্ষকদের যোগ্যতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁর মাত্র তিনটি মাপকাঠি ছিল— (১) যে বিষয়টি পড়াবেন সেই বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, (২) অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা থাকতে হবে। (৩) সময়নিষ্ঠ, সৎ জীবনযাপন করতে হবে। সময়টা ছিল আজ থেকে মোটামুটি ১৭০ বছর আগে। বিভিন্ন বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান যাতে শিক্ষার্থীদের হয়, তার জন্য লিখলেন 'বোধোদয়'। বইটি এখনকার দিনেও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক, কিন্তু এই ছোটো পুস্তকটির অস্তিত্বই হয়তো অজানা।

এর প্রায় ৩০ বছর পরে চালু হলো ইংরেজ ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা যার মূল কথা হলো— গায়ের রঙে ভারতীয় থাকবে, আর বাকি সমস্ত বিষয়ে ইউরোপীয়।

পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের ১৭-১৮ বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগে রাজনীতি তেমন ছিল না। তাহলে অনেক যোগ্য ব্যক্তি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরীয় শিক্ষাব্যবস্থায় যুক্ত হতে পারতেন না। তখন শ্রেণীকক্ষে যোগ্য শিক্ষকদের কাছেই ছাত্ররা পেত বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ। বাম আমলে অনিলায়ন হলেও যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষরা যে একদম চাকরি পেতেন না এমন নয়। তবে কোনো একটি শিক্ষকপদের ক্ষেত্রে দু'জন যোগ্য পদপ্রার্থী থাকলে, ওই দু'জনের মধ্যে বাম ঘেঁষা ব্যক্তিই চাকরি পেতেন। তৃণমূল আমলে শুধু রাজনীতি অর্থাৎ 'পার্থেনিয়াম' হলো তাই নয়; পার্থেনিয়াম-জাত দূষণ ছাড়াও শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্বৃত্তায়ন হলো। পরীক্ষার সময় খাতায় কিছু না লিখলেও চাকরি হলো বিশাল টাকার অঙ্কে। শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রে নয় দুর্বৃত্তায়ন হলো সব ক্ষেত্রেই। তৃণমূলের মূল নীতি— ছেড়ে দে মা লুটেপুটে খাই।

ইসলামি ব্যবস্থায় লুঠের মালকে বলা হয় গনিমতের মাল এবং এই লুঠ ও এই মাল বৈধ। এই মালের এক পঞ্চমাংশ 'খুম' দিতে হবে এবং চার-পঞ্চমাংশ থাকবে লুঠেরাদের। 'খুম' মানে আল্লার নামে দিতে হবে এবং আল্লার সঙ্গে যেহেতু একমাত্র নবির যোগাযোগ আছে জিব্রাইল মারফত, তাই খুমের অংশ নবি মহম্মদই নিতেন। সে যুগে আরবে কোনো কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল না। তাই নবি মহম্মদ যে কোনো নিয়ম চালু করতেন। নবি মহম্মদ ছিলেন ইসলামের 'প্রবর্তক'। নিশ্চিত ভাবে বলা কঠিন যে, তৃণমূল কংগ্রেসের 'প্রবর্তক' বা প্রতিষ্ঠাত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'খুম' নেন কিনা বা ৭৫-২৫ ব্যবস্থা তারই প্রবর্তিত কিনা। তবে রাজ্য জুড়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে 'লুঠ' যে চালু হয়েছে তা খালি চোখেই দেখা যায়। ডিপার্টমেন্ট অনুযায়ী গনিমতের মাল ভাগ হয়। তবে ডিপার্টমেন্ট যাই হোক লুঠের মাল ও খুম ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে।

অন্যান্য ক্ষেত্রে এর ক্ষতিকর প্রভাব যাই হোক, শিক্ষাক্ষেত্রে এর অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে। ছাত্র যদি একটু ভালো হয়, তাহলে বাবা-মা জমি, সম্পত্তি বিক্রি করেও ছাত্রটিকে অন্য রাজ্যে পাঠাচ্ছেন এখন। কারণ পশ্চিমবঙ্গে পড়াশোনার পরিবেশ নেই। এখন রাজ্যের কলেজগুলিতে অনেক আসনই খালি থাকছে। আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য অন্য সব জায়গা থেকে ছাত্ররা আসতেন।

শিক্ষার এই হাল হওয়ায় যোগ্যরা আর ওই পেশায় নেই। আগে খুব গর্বের সঙ্গে বলা হতো, আজ বঙ্গ যা ভাবে, অন্যান্যরা তা পরে ভাবে। মজা হলো, এই কথাটা আজও হয়তো সত্য তবে বিপরীত অর্থে। যদিও এত লুঠ ও 'খুম' ব্যবস্থা ভারতের অন্য কোনো রাজ্যে দেখা যায় না।

কেউ কেউ জিজ্ঞেসা করতে পারেন, যারা এই লুঠতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত, তারা সবাইতো সরাসরি 'প্রবর্তক'-এর বান্দা নন। তাঁদের কেউ কেউ তো বাম আমলের। কথাটা ঠিক। বাম আমল তো ধোয়া তুলসীপাতা ছিল না। আর বড়ো কথা হলো 'সংসর্গজা দোষাগুণাঃ ভবন্তি'। কোনো রোগের মতো যেগুলিকে আমরা 'ছোঁয়াচে' বলি। সেটি কোভিড হোক বা সর্দি-কাশি। আর এই ছোঁয়াচে রোগে মৃত্যুভয় নেই বলা চলে। ফলে আক্রান্ত হওয়া চলে— মৃত্যুর কোলে রোগী ঢলে পড়ে না, এটুকুই লাভ হয়।

'প্রবর্তক'-এর বান্দারা সবাই রোগাক্রান্ত। বাম জমানার ছোঁয়াচে রোগের জীবাণু তাদের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকী কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী যাঁদের টিভি-তে

অযৌক্তিক তর্ক করতে দেখা যায়, তারাও রোগগ্রস্ত। অবাক লাগে, শিক্ষিত না হলেও এরা গলাবাজি করে এত অযৌক্তিক কথা কীভাবে বলেন। খোঁজ নিলে দেখা যাবে এঁরাও 'প্রবর্তক'-এর বান্দা। টিভিতে গলাবাজির জন্য ভাতা পান হয়তো।

পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধিজীবী হয়তো অনেক রয়েছেন যাঁরা আগের আমলের বা হাল আমলের। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ নেই বললেই চলে। ফলে যেখানে টাকা, সেখানেই ভিড়। যেখানে ন্যায় চাওয়ার কথা সেখানে সবাই চুপ। এই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা মুখ খোলেন, কথা বলেন পয়সা পেলে। এইসব বুদ্ধিজীবীরা এখন মূলত অর্থলোভী হয়ে গেছে মনে হয়। চরিত্রহীন না হলে এরকম হয় না। সে চরিত্রহীন কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'চরিত্রহীন' নয়।

এখন পশ্চিমবঙ্গের বৈশিষ্ট্য হলো— চুরি ও ভাতা। কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা পাঠায়— তার হিসাব রাজ্য সরকার দেয় না। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাওনা টাকার দাবি করে, কিন্তু হিসাব দেওয়ার দায়িত্ব তারা পালন করে না। রাজ্য সরকারের এমন কোনো বিভাগ ও দপ্তর নেই যেখানে লুঠ হচ্ছে না। লুঠের মাল 'খুম' দিয়ে গায়েব করা হচ্ছে।

রাজ্যে কোনো বড়ো ম্যানুফ্যাকচারিং সংস্থার অস্তিত্ব নেই। এখানে শেষ হয়ে গিয়েছে শিল্পোৎপাদন। বামফ্রন্ট যেগুলি ধ্বংস করেছিল সেগুলিতে মাথাচাড়া দিচ্ছে বহুতল। শিল্প না থাকার ফলে রাজ্যে কোনো চাকরি নেই। রোজগারের একমাত্র পথ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন— চপের দোকান আর কাশফুলের বালিশ। চপ আর কাশফুল নিয়ে তিনি ব্যাপকভাবে 'ভোকাল', কারণ ওইগুলি 'লোকাল'! পশ্চিমবঙ্গের ৫০ লক্ষ মানুষ বিভিন্ন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক। এছাড়াও বেকারত্বের জ্বালায় জর্জরিত এ রাজ্যের বড়ো অংশের যুবসমাজ। প্রতি বছর মুখ্যমন্ত্রী বহু কোটি টাকা খরচ করে একটি করে সভা বা 'শিল্প সম্মেলন' করেন— শিল্পসংস্থাগুলিকে আমন্ত্রণ করেন। অনেক মৌ স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু কেউ আসে না। রাজ্যে স্থাপিত হয় না কোনো ছোটো-বড়ো-মাঝারি শিল্প। একজন বিখ্যাত বাঙ্গালি সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে স্পেনে গিয়ে ঘোষণা করেছিলেন ২৫০০ কোটি টাকার একটি শিল্প বানাবেন শালবনীতে। পরে শালবনীর পরিবর্তে গড়বেতায় এই শিল্প স্থাপিত হবে বলে ঘোষিত হয়। বর্তমানে সেই বিখ্যাত বাঙ্গালি রয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীও স্বপদে বহাল রয়েছেন, কিন্তু শালবনী বা গড়বেতা— কোথাও প্রস্তাবিত সেই শিল্প দেখেনি দিনের আলোর মুখ। মনে হয় গর্ভেই তার মৃত্যু হয়েছে। ১৯৪৭- ২০১১ পর্যন্ত ৬৪ বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঋণ ছিল প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা, কিন্তু প্রগতিশীল এই মুখ্যমন্ত্রীর ১৪ বছরের শাসনে রাজ্যের ঋণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকায়। তাই তিনি গর্ব করে বলেন— 'এগিয়ে বাংলা'! এছাড়াও তাকে বলতে শোনা যায়— 'আমি বেতন নিই না। নিজের খরচ নিজেই চালাই।'

তবে মানুষটি ধার্মিক! সরকারি খরচে দীঘায় জগন্নাথধাম বানিয়েছেন। চাইছেন, তাঁর দুধেল গাইয়েরা সরকারি খরচে মসজিদ তৈরির দাবি করুক। তিনি অনেক মন্ত্র জানেন, যা তিনি জনসভায় জাহির করেন। মন্ত্র জানা লোকেরা আড়ালে ওই ভুল মন্ত্র ও উচ্চারণ শুনে হেসে গড়িয়ে পড়েন। নিজেকে 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'অসাম্প্রদায়িক' প্রমাণের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মুসলমান পরবে হিজাব পড়ে নমাজে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। অমুসলমানদের নমাজে থাকার নিয়ম নেই। অমুসলমানরা নমাজে গেলেও দূর থেকে তা দেখে ও শোনে। মক্কার কাবায় অমুসলমানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। মুসলমানদের চোখে হিন্দুরা হলো 'কাফের'। অংশীবাদী হওয়ার কারণে তাদের কাছে হিন্দুরা ব্রাত্য।

শোনা যায়, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ভারতের সব রাজ্যে ভাষাই জানেন। অনেক বিদেশি ভাষাও রপ্ত করেছেন বলে তার দাবি। ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় বাঙ্গালি অস্মিতার বক্তৃতাও তিনি করেছেন। তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রচিত গানের ভাষা বা শব্দ পাল্টানোর ক্ষমতা রাখেন। এ রাজ্যে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের মতো তিনিও স্লোগান দেন 'জয় বাংলা'! পশ্চিমবঙ্গের জন্য আলাদা 'জাতীয় সংগীত'-এর ব্যবস্থা করেছেন। 'রামধনু'কে 'রংধনু', 'অভিনন্দন'কে 'শুভনন্দন' বানিয়েছেন।

এই সর্ব গুণ ও প্রতিভাসম্পন্ন মানবীটি সবই পারেন কেবল একটি ছোট্ট কাজ বাকি রয়েছে, তা হলো— 'পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন'।

আর বাঙ্গালি— যারা একদা ভারতকে পথ দেখাতো, তারা এখন শুধু তাঁর প্রশংসায় মুখর। □

Medmitra Bijonsikha Group
HEALTH CARE
A-10/2, Purbadiganta, Santoshpur, Kolkata - 700 075
Mobile : +91 7980124001, E-mail : customercare@bijonsikha.com
Website : www.bijonsikha.com
Associated with manipalhospitals

আমরা বয়স্কদের বিভিন্ন পরিষেবা দিয়ে থাকি

- এছাড়াও আমরা বাড়িতে ডাক্তার / নার্স / ফিজিওথেরাপিস্ট / অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা দিয়ে থাকি।
- সমস্ত রকম প্যাথলজিক্যাল টেস্ট ১৫ থেকে ২০ শতাংশ ছাড়ে লিউপিন ডায়গনস্টিকস্ থেকে করিয়ে থাকি।
- সমস্ত রকম মেডিক্যাল যন্ত্র আমরা ভাড়ায় দিয়ে থাকি। Oxygen Concentrator | Pulse Oximeters | Walkers Suction Machine | Multi Parameter Monitors | Nebulizer Wheelchair | Hospital Beds | Air Mattresses

আমরা বাড়িতে গিয়ে এই পরিষেবাগুলি দিয়ে থাকি —
Holter | ECG | Uroflometry | ABPM | EEG | EMG | NCV | SSEP | RNS | BAER | VEP | PFT | PSG (Sleep Apnea) | Portable Ventilator | ABPM

আমরা মাসিক ২,৯৯৯/- টাকার বিনিময়ে CGHS কর্মচারীদের বিভিন্ন পরিষেবা দিয়ে থাকি

- মুদিখানা বাজার - মাসে একবার
- ব্যাংক থেকে টাকা তোলা - মাসে একবার
- আপৎকালীন সময়ে হাসপাতালে ভর্তির সহযোগীতা
- ডাক্তারের চেম্বারে অথবা CGHS ডিসপেনসারীতে নিয়ে যাওয়া আসা - মাসে একবার
- CGHS ডিসপেনসারী থেকে ওষুধ এনে দেওয়া - মাসে একবার
- ১৫ থেকে ২০ শতাংশ ছাড় সমস্ত প্যাথলোজিক্যাল পরীক্ষার ওপর
- ৩ মাসের অগ্রিম টাকা দিলে দু'বার বাড়িতে ডাক্তার পরিষেবা বিনামূল্যে

বঙ্গভঙ্গ ও পরবর্তী সময়ে বঙ্গের স্বদেশী আন্দোলনে বন্দেমাতরমের ভূমিকা অবিস্মরণীয়

জলবায়ু পরিবর্তন এবং ঔপনিবেশিক নীতি-জাত রাজনৈতিক অর্থনীতির মিথোস্ক্রিয়ার ফলে ১৮৯৯-১৯০০ সালে দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয় ভারত। এই কারণে জীবিকা নির্বাহের নিরাপত্তা অপেক্ষা রাজস্ব স্থিতিশীলতা, বিশ্ব বাজার এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সামরিক বাধ্যবাধকতাকে অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য হয় তৎকালীন ব্রিটিশ ভারত। কঠোরভাবে রাজস্ব সংগ্রহ, দেশীয় কৃষিজাত পণ্যের অবাধ রপ্তানি, সীমিত ত্রাণ, সরকারি দায়বদ্ধতা অস্বীকার ইত্যাদি ১৮৯৯-১৯০০ সালে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের কারণ বলে ইতিহাসবিদরা মনে করেছেন। ভারতের ওপর ব্রিটিশদের দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া ভয়ংকর ঔপনিবেশিক শাসনের কারণেই এই মানবিক বিপর্যয় বলে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। ভারতের ১২ লক্ষ ৩০ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা এবং প্রায় ৬ কোটি ভারতবাসীর ওপর প্রভাব ফেলে এই দুর্ভিক্ষ। প্রায় ৪৫ লক্ষ মানুষ এই দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারায়।

এভাবে দেশবাসীর ঘৃণা ব্রিটিশ বিরোধী জনরোষে পরিণত হতে থাকে। জনরোষ তীব্র হয়ে উঠলেও বড়লাট কার্জনের মতো স্বৈরশাসক আরও বেশি একগুঁয়ে হয়ে ওঠে। তার নির্দেশে প্রশাসন আরও নিপীড়ন শুরু করে। সেই সময় দেশের রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, বড়ো শহরগুলির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্কোয়ার, নদীর তীরে সর্বত্র 'বন্দে মাতরম্' গান ও ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। গানটিতে প্রকাশিত দেশাত্মবোধ জাগরণের অনুভূতি এবং এর দ্বারা উদ্ভূত রাষ্ট্রচেতনা ভারত শাসনের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসকদের কাছে প্রবল চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। এই সংগীতের দ্বারা জনসাধারণ উজ্জীবিত হয়ে ওঠার ফলে তাঁদের প্রতি ইংরেজ প্রশাসন আরও নির্মম হয়ে ওঠে এবং সাধারণ পুরুষ ও মহিলারা— যাঁরা 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ করত, তাঁদের প্রকাশ্যে বেত্রাঘাতের শাস্তি ঘোষণা করে। 'স্বদেশী আন্দোলন' নিষিদ্ধ করা হয়। এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কার্যকর্তা, যাঁরা সরকারি কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের পদচ্যুত ও বরখাস্ত করতে শুরু করে ব্রিটিশ সরকার। এই আন্দোলনে যুক্ত ছাত্রদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং নানা প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হয়। জনসাধারণের কণ্ঠস্বর এবং ব্রিটিশ প্রশাসন বিরোধী কর্মকাণ্ডকে থামিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে বড়লাট কার্জন।

স্বদেশী আন্দোলন অব্যাহত রাখতে ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয় 'বরিশাল পরিষদ'। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। ব্রিটিশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে 'বন্দে মাতরম্' গানটি নিষিদ্ধ করে, যা ততক্ষণে জাতীয় সংগীতের তুলনীয় মর্যাদা অর্জন করেছিল। দেশবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং সরকারি সিদ্ধান্ত অমান্য করার সিদ্ধান্ত নেয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সংঘটিত আন্দোলনে যখন সাধারণ মানুষ 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি সহকারে শোভাযাত্রা শুরু করে, তখন অংশগ্রহণকারীদের ওপর নেমে আসে তীব্র পুলিশি দমনপীড়ন। স্বেচ্ছাসেবকদের বুক থেকে 'বন্দে মাতরম্' লেখা ব্যাজ ছিঁড়ে ফেলে দিতে থাকে পুলিশ। শোভাযাত্রাকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয় এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই আহত হন, তাঁদের শরীরে সৃষ্ট ক্ষত থেকে রক্ত ঝড়তে থাকে, তা সত্ত্বেও তাঁদের কণ্ঠোৎসারিত 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে মুখরিত হয় আকাশ-বাতাস।

বরোদা রাজ্যের চাকরি থেকে অব্যাহতি নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন শ্রীঅরবিন্দ। শুরু করেন 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা, যা ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসে একটি অমর ও অবিস্মরণীয় সংবাদপত্রে পরিণত হয়। প্রাণবন্ত লেখনশৈলী এবং তীক্ষ্ণ চিন্তাভাবনার মাধ্যমে তিনি পাঠকদের হৃদয় জয় করে নেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলি পড়ে প্রেরণা পান বহু মানুষ। তাঁর ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ 'যুগান্তর' পত্রিকা শুরু করেন। 'বন্দে মাতরম্' ও 'যুগান্তর' ব্রিটিশ সরকারের কাছে অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। 'বন্দে মাতরম্' গানটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন শ্রীঅরবিন্দ, যা বর্তমান ভারত সরকারের জাতীয় পোর্টাল দ্বারা গৃহীত হয়েছে। মূল বন্দে মাতরমে ৬টি স্তবক রয়েছে। পুরো গানটিই পদ্য অনুবাদ করেন শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীঅরবিন্দ অনূদিত 'মাদার, আই বো টু দী!'-শীর্ষক ইংরেজি কবিতাটি ১৯০৯ সালের ২০ নভেম্বর 'কর্মযোগিন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ 'বন্দে মাতরম্'-এর ইংরেজি অনুবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'ভারতের জাতীয় সংগীতকে অন্য ভাষায় পদ্যে অনুবাদ করা কঠিন, কারণ এর অনন্য মিষ্টত্ব, সারল্য ও উচ্চ কাব্যিক শক্তি রয়েছে।'

১৯১০ সালে আলিপুর বোমা মামলা থেকে শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পাওয়ার পর , সত্য ও শক্তির সন্ধানে যোগসাধনার লক্ষ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করার জন্য তিনি পণ্ডিচেরীতে পৌঁছন। সেখানে যোগ সাধনায় মগ্ন হন। এর ফলে বিপ্লবের একজন পথিকৃৎকে হারায় ভারতবাসী, বঙ্গের বিপ্লবী আন্দোলন যেন ক্ষণিকের জন্য হয়ে যায় স্তিমিত ও অভিভাবকহীন। পরের বছর বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয় ব্রিটিশ প্রশাসন। বঙ্গকে একীভূত করার সিদ্ধান্ত তারা নিলেও ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করে। কিন্তু তাতে 'বন্দে মাতরম্'-এর আগুন নিভে যায়নি।

১৯১৫ সালের মধ্যে ঢাকা ও কলকাতায় অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দলের মতো বিপ্লবী সংগঠন ছাড়াও স্বদেশ বান্ধব, বৃত্তি, সাধনার মতো পত্রপত্রিকাকে একটি আলোকবর্তিকা দিয়েছিল 'বন্দে মাতরম্'। উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, 'বন্দে মাতরম্' হলো সেই শব্দবন্ধ, সেই বোধনমন্ত্র, দেশাত্মবোধ জাগরণের সেই বন্দনাগীতি যা লোকমান্য তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিনী কুমার দত্ত, শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম বসু, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), মাস্টারদা সূর্য সেন, ভগৎ সিংহের মতো ভারত জননীর মহান সন্তানদের রাষ্ট্রসাধনায় অনুপ্রাণিত করে। □

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৪১)

প্রথম 'আজ্ঞা', প্রথম প্রার্থনা, প্রথম উৎসব পালন

১৯২৬ সালের ২৬ মে থেকে শুরু হয়েছিল স্বয়ংসেবকদের দণ্ড শিক্ষা ব্যবস্থা। আগেই জেনেছি এর নেতৃত্বে ছিলেন আন্না সোহনী। তিনি ছিলেন এই বিষয়ে অত্যন্ত পারঙ্গম ব্যক্তিত্ব। দণ্ড শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজন মনে হয়েছিল 'আজ্ঞা'র। তখন সর্বত্র ইংরেজিতেই এ ধরনের 'আজ্ঞা'র প্রচলন ছিল। কিন্তু সব ভাষায় 'আজ্ঞা' তৈরির প্রয়াস হলো এখানে। মারাঠা, হিন্দি, সংস্কৃতকে ভিত্তি করে প্রথম নিজ ভাষায় 'আজ্ঞা' (Comnand) শব্দ শুরু হলো— সাবধান, দক্ষ, আরম ইত্যাদি। কিন্তু তখনো সামরিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ইংরেজি 'আজ্ঞা'ও ব্যবহার হতো। প্রতিদিন এই শারীরিক কার্যক্রমের পরে সুন্দরভাবে প্রভাবী সমাপ্তির জন্য প্রার্থনার কথা অনুভূত হলো। এর মধ্যে প্রথমটি মারাঠি পদ, দ্বিতীয়টি হিন্দি। প্রথমটির সূত্র জানা না গেলেও প্রাথমিক পাঠশালাগুলিতে ওই পদ গাওয়া হতো। আর হিন্দি অংশ 'আর্য সমাজ'-এ প্রচলিত প্রার্থনার কিছু পরিবর্তিত রূপ। প্রথম প্রার্থনা ছিল এরূপ—

'নমো মাতৃভূমি জিথে জন্মলো মী
নমো হিন্দুভূমি জিথে বাড়লো মী
নমো ধর্মভূমি জিয়ে চ্যাচ কামীঁ
পড়ো দেহ মাঝা সদাতী নমী মী।।'

'হে গুরো, শ্রীরামদূতা শীল হমকো দিজিয়ে
শীঘ্র সারে সদ্‌গুণো সে পূর্ণ হিন্দু কীজিয়ে
লীজিয়ে হমকে শরণ মেঁ রামপন্থী হম বনেঁ।
ব্রহ্মচারী ধর্মরক্ষক বীর ব্রতধারী বনেঁ।।'

শারীরিক, দণ্ড, কুচকাওয়াজ (প্যারেড) এবং প্রার্থনার ফলে শাখার প্রতি তরুণদের আগ্রহ অনেক বেড়ে গেল। ডাক্তারজী সঙ্ঘে প্রথম উৎসব রূপে 'রক্ষাবন্ধন' পালন করেন। তখন প্রচলিত ছিল ভাইদের হাতে বোনেরা রক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে এবং সমাজ রক্ষার বার্তা দিয়ে ব্রাহ্মণরা সকলকে রাখি বাঁধতো। কিন্তু ডাক্তারজী এই উৎসব ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরস্পরকে রক্ষার সংকল্পে রাষ্ট্র রক্ষার কাজে ব্রতী হওয়ার রূপদান করলেন। সঙ্ঘের এই প্রথম উৎসব তুলসীবাগে বেলা ২টার সময় বৈঠকের রূপে পালন করা হয়। প্রথম বার্ষিকোৎসব ডাক্তারজী নিজ গৃহেই পালন করেন। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে এই উৎসবে অনাথ বিদ্যার্থী গৃহের ছাত্ররাও ছিল। উৎসবে সভাপতির ভাষণ দেন বাপুরাও আম্বের্ডেকর। সব শেষে দেশভক্তি গান সকলে মিলে গাওয়া হয়— 'পরম পাবন ভগব্যা ঝেন্ডয়া, কায় দশা তব হী'। প্রথম বার্ষিকোৎসবের উল্লেখনীয় ঘটনা ছিল— ডাক্তারজী স্বয়ংসেবকদের জন্য একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন।

(৪২)

প্রথম পথসঞ্চলন—প্রথম শঙ্খনাদ

মোহিতে সঙ্ঘস্থানে নিয়মিত শাখা শুরু হওয়ার পর সেখানে সঞ্চলনের অভ্যাস হতে থাকে। ডাক্তারজী স্বয়ংসেবকদের গণবেশ প্রস্তুত করার জন্য প্রথম থেকেই আগ্রহ প্রকাশ করলেন। মাঝে মাঝে রাস্তায়ও এই সঞ্চলনের অভ্যাস চলতো। এইভাবে প্রথম ব্যবস্থিত পথসঞ্চলনে গণবেশধারী ত্রিশজন স্বয়ংসেবক অংশগ্রহণ করেছিল। সিটির তালে তালে পা মিলিয়ে তারা যখন অনুশাসনবদ্ধভাবে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তখন তা সাধারণ নাগরিকের কাছে এক অভাবনীয়, অত্যন্ত প্রেরণাদায়ী দৃশ্য ছিল। বেশকিছু বালক তো সঞ্চলনের শেষে একইরকম পা মিলিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত এসেছিল।

সামরিক শিক্ষায় ডাক্তারজীর প্রথম থেকেই আগ্রহ ছিল। উপাসনী নামে গোয়ালিয়রের একজন সৈনিক অধিকারী ছুটিতে নাগপুরে এলে স্বয়ংসেবকদের মধ্যে সামরিক শিক্ষায় নিপুণতা বৃদ্ধির জন্য তাঁর কাছে পাঠাতেন। তিনি ঘরের মধ্যেই দেশলাইয়ের কাঠি সাজিয়ে কৃষ্ণরাও লাম্বে প্রমুখ তরুণদের পথক-রচনা (গট), ব্যূহ রচনার শিক্ষা দিতেন। সামরিক শিক্ষায় উৎসাহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংসেবকদের কাছে ঘোষের (বাদ্যের) বড়ো প্রয়োজন মনে হলো। কমপক্ষে একটা বিউগল বাজলেও কাজ হয়। একটা স্বপ্ন ছিল তাদের চোখে। কিন্তু সঙ্ঘের কাছে তো পয়সা নেই। কারণ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ও সঙ্ঘ উভয়েরই জন্ম দারিদ্র্যের মধ্যে। ছাত্র স্বয়ংসেবকরা টিফিন থেকে এক পয়সা করে বাঁচিয়ে অর্থ জমানো শুরু করলো।

সে সময় নাগপুরে গোকুলাষ্টমী উপলক্ষ্যে শ্রীমন্ত বটীর বড়ীর বাসভবনে সাতদিন ধরে মুক্তদ্বার ব্রাহ্মণ ভোজনের অনুষ্ঠান হতো। ডাক্তারজীর কথায় কয়েকজন স্বয়ংসেবক ঠিক করলেন তাতে অংশগ্রহণ করার। দাদারাও পরমার্থ, বালাসাহেব দেওরস, কৃষ্ণরাও মোহরী প্রমুখ স্বয়ংসেবক। ভোজন সেখানে উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল 'দক্ষিণা'র। সমস্ত অর্থ একত্রিত করে বিউগল কেনা হলো। সঙ্ঘস্থানে প্রথম সে 'শঙ্খ' (বিউগল) নাদের মধ্যে ঘোষিত হলো স্বয়ংসেবকদের নিষ্ঠা, ত্যাগ রাষ্ট্রভক্তি ও অধ্যবসায়ের এক নবীন বার্তা। স্বয়ংসেবকদের মনে উচ্ছ্বাস যেন শতগুণে বৃদ্ধি পেয়ে তরঙ্গায়িত হতে শুরু করলো।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস